

সূচিপত্র

রোগী ও মানবসেবার ফজিলত	১৭
ড. মুহাম্মদ ঈসা শাহেদী	
রাসূল সা. এর যুদ্ধনীতি: মানবতা, সংযম ও শৃঙ্খলার ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত	২৫
প্রফেসর ড. আ.ক.ম. আবদুল কাদের	
মুরতাদের পরিচয়, পরিণাম ও কারণসমূহ	৩৫
ড. মাওলানা মুহাম্মদ নেজাম উদ্দিন	
আল-কুরআন ও আধুনিক বিজ্ঞান	৩৮
ড. মাওলানা গিয়াস উদ্দিন তালুকদার	
ইসলামে তাসাউফের গুরুত্ব	
মানবজীবনে এর প্রয়োজনীয়ত	৪৬
ড. মুহাম্মদ এনামুল হক মুজাদ্দিদী	
ফতোয়া প্রদানের নীতিমালা ও শর্তাবলী	৬০
আবু মুসা মুহাম্মদ খালেদ জমীল	
জাতিগত সম্প্রীতি রক্ষায় ইসলামের অবদান	৬৯
হাফেজ মাওলানা আব্দুল মান্নান শামসী	
কিয়ামতের ময়দানে শানে মোস্তফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)	৭৮
মুহাম্মদ শহীদুল হক হোসাইনী	
ইলমে তাসাউফ বা তরীকত শিক্ষার গুরুত্ব	৮৬
মুহাম্মদ হাফিজুল হক নিজামী	
বিদায় হজ্জে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রদত্ত ভাষণের গুরুত্ব ও তাৎপর্য	৯৩
আলহাজ মাওলানা ওবাইদুল্লাহ হামযা	
আওলিয়া কেরামের পরিচয় ও দ্বীন ইসলামের সংস্কারে মুজাদ্দিদে আলফে সানী (রহ.)-এর অবদান	১০২
আলহাজ মাওলানা আজিজুল হক আল-মাদানী	
নবীজি (ﷺ)-এর অনুসরণেই মুক্তি	১০৮
১	সীরত

অধ্যক্ষ আবু সালেহ মুহাম্মদ ছলীমুল্লাহ	
সূরা ফাতিহার ফাযায়েল	১১৭
তোয়হা মুহাম্মদ মোদাসির	
আমল কবুল হওয়ার জন্য বিশুদ্ধ ঈমান অপরিহার্য	১২৩
আলহাজ্ব মাওলানা মুহাম্মদ জিয়াউল করিম	
পুনরুত্থান ও হাশরের ময়দানের বর্ণনা	১২৯
হাফেজ মাওলানা মুহিউদ্দিন মাহবুব	

ভূমিকা

সীরাতের অমিয় আলোয় প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين،
وعلى آله وصحبه أجمعين.

সকল প্রশংসা সেই মহান সত্তার জন্য, যিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং
ঈমানের অমূল্য নিয়ামতে ধন্য করেছেন। অগণিত দরুদ ও সালাম বর্ষিত
হোক সর্বশ্রেষ্ঠ নবী, সর্বশেষ রাসূল, রহমাতুল্লিলি আলামিন, হযরত মুহাম্মদ
মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র সত্তার ওপর। আরও দরুদ
ও সালাম বর্ষিত হোক তাঁর পবিত্র আহলে বাইত, সাহাবায়ে কেরাম,
তাবেঈন, তাবে-তাবেঈন এবং কিয়ামত পর্যন্ত তাঁর আদর্শ অনুসরণকারী
সকল মুমিনের ওপর।

মানবসভ্যতার দীর্ঘ ইতিহাসে অসংখ্য মহান ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব ঘটেছে।
কেউ জ্ঞান দিয়ে, কেউ নেতৃত্ব দিয়ে, কেউ বীরত্ব দিয়ে, কেউ দর্শন দিয়ে
মানবসভ্যতাকে প্রভাবিত করেছেন। কিন্তু হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন ও কর্ম এমন এক অনন্য পূর্ণতা ধারণ করে,
যা একই সঙ্গে ইবাদত, আধ্যাত্মিকতা, নৈতিকতা, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র,
অর্থনীতি, মানবিকতা, ন্যায়বিচার ও শান্তির জন্য সর্বকালীন আদর্শ।

তাঁর পবিত্র জীবন শুধু অতীতের ইতিহাস নয়—এটি বর্তমানের পথনির্দেশ
এবং ভবিষ্যতের আলোকবর্তিকা। তাই সীরাতুননবী (ﷺ)-এর আলোচনা যত
বিস্তৃত হবে, মানবতার কল্যাণের সম্ভাবনাও তত বিস্তৃত হবে।

মহান আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন—

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

“নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ।”

এই আয়াতের মর্মার্থ আমাদের মনে করিয়ে দেয়—রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনকে জানা মানে শুধু ইতিহাস জানা নয়; বরং
একটি পূর্ণাঙ্গ আদর্শের সঙ্গে পরিচিত হওয়া। তাঁর চরিত্রকে হৃদয়ে ধারণ
করা, তাঁর সুন্নাতকে জীবনে বাস্তবায়ন করা এবং তাঁর ভালোবাসাকে
ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে লালন করা ই সীরাতচর্চার প্রকৃত উদ্দেশ্য।

বাংলার ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসে চুনতীর নাম আজ এক বিশেষ মর্যাদায় উচ্চারিত হয়। এর অন্যতম কারণ, আশেকে রাসূল, মুজাদ্দিদে মাহফিলে সীরাতুননবী (ﷺ), হযরত শাহ মাওলানা হাফেজ আহমদ প্রকাশ শাহ সাহেব কেবলা চুনতী (রহ.)-এর দূরদর্শী চিন্তা ও অক্লান্ত সাধনা।

তিনি উপলব্ধি করেছিলেন-রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর জীবন ও আদর্শকে যদি মানুষের সামনে ধারাবাহিকভাবে, বিষয়ভিত্তিকভাবে এবং বৃহৎ পরিসরে উপস্থাপন করা যায়, তবে তা সমাজের নৈতিক ও আত্মিক পুনর্জাগরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। সেই উপলব্ধি থেকেই তিনি প্রবর্তন করেন ঐতিহাসিক ১৯ দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক মাহফিলে সীরাতুননবী (ﷺ)।

সময় গড়িয়েছে। প্রজন্ম পরিবর্তিত হয়েছে। সমাজের কাঠামো বদলেছে। প্রযুক্তি ও যোগাযোগব্যবস্থায় এসেছে অভাবনীয় পরিবর্তন। কিন্তু চুনতীর সীরাতের ময়দান তার মৌলিক লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হয়নি। বরং সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এর আবেদন ও পরিসর আরও বিস্তৃত হয়েছে।

এটি কেবল একটি মাহফিলের নাম নয়; এটি বহু মানুষের নবীপ্রেমের স্মৃতি, সীরাতচর্চার একটি দীর্ঘ ঐতিহ্য এবং প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে পৌঁছে দেওয়া একটি আমানত।

প্রতি বছর এই মাহফিলে দেশ-বিদেশের অসংখ্য বিজ্ঞ আলেম, মুফাসসির, মুহাদ্দিস, গবেষক ও চিন্তাবিদ সীরাতুননবী (ﷺ)-এর বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন। তাঁদের বক্তব্যে উঠে আসে প্রিয় নবীজির পবিত্র জীবনের বিচিত্র অধ্যায়, তাঁর অতুলনীয় চরিত্র, দাওয়াতি প্রজ্ঞা, পারিবারিক আদর্শ, সামাজিক ন্যায়বিচার, মানবিকতা, রাষ্ট্র পরিচালনার নীতি, সাহাবায়ে কেরামের প্রতি তাঁর স্নেহ এবং উম্মতের প্রতি তাঁর অসীম দরদ। মাহফিলের ময়দানে বসে এসব আলোচনা শুনতে শুনতে বহুবার মনে হয়েছে-এগুলো শুধু শোনার জন্য নয়; এগুলো সংরক্ষণ করারও প্রয়োজন আছে।

কারণ মানুষের স্মৃতি সীমিত। সময় চলে যায়। প্রজন্ম পরিবর্তিত হয়। কিন্তু লিখিত শব্দ টিকে থাকে। একটি গ্রন্থ বহু বছর পরেও একজন পাঠকের হাতে পৌঁছাতে পারে, একজন গবেষককে তথ্য দিতে পারে, একজন তরুণকে অনুপ্রাণিত করতে পারে এবং একজন সাধারণ পাঠকের হৃদয়ে নবীপ্রেমের নতুন আলো জ্বালাতে পারে।

এই উপলব্ধি থেকেই দীর্ঘদিন ধরে আমার মনে একটি আকাঙ্ক্ষা লালিত হচ্ছিল-চুনতীর ঐতিহাসিক ১৯ দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক মাহফিলে সীরাতুননবী (ﷺ)-এর বিষয়ভিত্তিক আলোচনার ওপর একটি স্মারক গ্রন্থ প্রকাশ করা।

সত্যি বলতে, এটি ছিল আমার সামর্থ্যের তুলনায় অনেক বড় একটি স্বপ্ন। তবুও স্বপ্ন দেখার সাহস করেছি, কারণ কাজটি ব্যক্তিগত কোনো অর্জনের জন্য নয়; বরং সীরাতের এই ঐতিহাসিক ধারার কিছু মূল্যবান অংশ সংরক্ষণের একটি ক্ষুদ্র প্রয়াস হিসেবে। এই উদ্যোগ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মাহফিলের পূর্বে ও পরে সম্মানিত ওলামায়ে কেরাম, আলোচক ও লেখকদের সঙ্গে বিভিন্নভাবে যোগাযোগ করা হয়। টেলিফোনে কথা বলা হয়েছে, প্রস্তাবিত বিষয় সম্পর্কে জানতে চাওয়া হয়েছে এবং তাঁদের আলোচিত বিষয়ের ওপর লিখিত প্রবন্ধ প্রদানের জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ করা হয়েছে।

অনেক সম্মানিত আলেম তাঁদের ব্যস্ততার মধ্যেও আন্তরিক সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। কেউ প্রবন্ধ দিয়েছেন, কেউ বিষয় নির্ধারণে পরামর্শ দিয়েছেন, কেউ তথ্য দিয়েছেন, আবার কেউ নানা সীমাবদ্ধতার কারণে লেখা দিতে না পারলেও উৎসাহ ও দোয়া করেছেন।

সবার কাছ থেকে লেখা সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। ১৯ দিনের দীর্ঘ আয়োজনের প্রতিটি আলোচনা এই গ্রন্থে স্থান দেওয়াও সম্ভব নয়। তাই নির্বাচিত কিছু বিষয় ও প্রবন্ধ নিয়ে এই সংকলন প্রস্তুত করা হয়েছে।

এই কারণে গ্রন্থটিকে ১৯ দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক মাহফিলে সীরাতুননবী (ﷺ)-এর পূর্ণাঙ্গ আলোচনামালা হিসেবে না দেখে একটি নির্বাচিত স্মারক সংকলন হিসেবে বিবেচনা করার জন্য পাঠকের প্রতি বিনীত অনুরোধ রইল। কোনো মহৎ কাজ শুরু করার জন্য শুধু ইচ্ছা যথেষ্ট নয়; প্রয়োজন সাহস, প্রেরণা ও শুভাকাঙ্ক্ষীর উৎসাহ। ২০২৬ খ্রিস্টাব্দের প্রথম দিকে আমার পরম শ্রদ্ধেয় রাহবার, হযরত শাহজাদা আলহাজ্ব মাওলানা আবদুল মালেক ইবনে মু. দিনার নাজাত সাহেবের কাছে যখন এই ভাবনার কথা তুলে ধরি, তিনি অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে আমাকে উৎসাহিত করেন। তাঁর সেই অনুপ্রেরণা আমার জন্য ছিল বিশেষ সাহসের উৎস।

তাঁর উৎসাহকে পাথেয় করে এই গ্রন্থ প্রকাশের কাজ হাতে নিই। মহান আল্লাহর অশেষ রহমতে ধীরে ধীরে সেই স্বপ্ন বাস্তব রূপ লাভ করতে শুরু করে।

এই জায়গায় এসে আমি উপলব্ধি করেছি—একটি ভালো কাজের সূচনা কখনো কখনো একজন মানুষের ইচ্ছা থেকে হয়, কিন্তু তার সফলতা আসে অনেক মানুষের দোয়া, ভালোবাসা ও সহযোগিতায়।

আজকের পৃথিবী অভূতপূর্ব বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত অগ্রগতির যুগে প্রবেশ করেছে। মানুষের হাতে তথ্যের অভাব নেই। মুহূর্তের মধ্যে পৃথিবীর এক প্রান্তের সংবাদ অন্য প্রান্তে পৌঁছে যাচ্ছে। কিন্তু তথ্যের প্রাচুর্য সবসময় মানুষের চরিত্রের উন্নতি ঘটায় না।

আজও মানুষ অশান্ত। পরিবারে সংকট, সমাজে বিভাজন, পারস্পরিক অবিশ্বাস, নৈতিক অবক্ষয় ও মূল্যবোধের সংকট আমাদের চারপাশে দৃশ্যমান।

এই সংকটের সময়ে আমাদের ফিরে যেতে হবে সেই মহান আদর্শের কাছে, যিনি অন্ধকার যুগের মানুষকে আলো দেখিয়েছিলেন; বিভক্ত মানুষকে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করেছিলেন; প্রতিশোধের পরিবর্তে ক্ষমার শিক্ষা দিয়েছিলেন; অন্যায়ের পরিবর্তে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন; এবং মানুষকে মানুষ হিসেবে মর্যাদা দিতে শিখিয়েছিলেন। তিনি হলেন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

তাই সীরাতুননবী (ﷺ)-এর আলোচনা আজ শুধু ধর্মীয় প্রয়োজন নয়; এটি মানবিক, নৈতিক ও সামাজিক প্রয়োজনও। এই গ্রন্থের প্রত্যাশা—পাঠক যেন এখানে শুধু কিছু প্রবন্ধ না পান; বরং নিজের জীবনকে নবীজির আদর্শে পরিশুদ্ধ করার কিছু উপকরণ পান।

এই গ্রন্থ আমাদের কাছে একটি আমানত। এই আমানত লেখকদের জ্ঞান ও চিন্তার, আলেম-ওলামার পরিশ্রমের, সহযোগীদের ভালোবাসার এবং সর্বোপরি চুনতীর দীর্ঘ সীরাত-ঐতিহ্যের।

তাই সম্পাদনার সময় লেখকদের বক্তব্যের মূল সুর অক্ষুণ্ণ রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। ভাষা, বানান, বাক্যবিন্যাস ও উপস্থাপনায় প্রয়োজনীয় সম্পাদনা করা হলেও প্রত্যেক লেখকের নিজস্ব বক্তব্য ও চিন্তার স্বাভাবিক বজায় রাখার প্রতি যত্ন নেওয়া হয়েছে।

তারপরও অনিচ্ছাকৃত কোনো ভুল-ত্রুটি থেকে গেলে তার দায় সম্পূর্ণভাবে সম্পাদকের। বিজ্ঞ পাঠক ও আলেম-ওলামার কাছে বিনীত অনুরোধ-কোনো ভুল চোখে পড়লে তা সংশোধনের জন্য আমাদের অবহিত করবেন। তাঁদের পরামর্শ ভবিষ্যৎ সংস্করণকে আরও সমৃদ্ধ করবে।

এই গ্রন্থ প্রকাশের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যাঁরা সম্পৃক্ত হয়েছেন, তাঁদের প্রত্যেকের প্রতি আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

সম্মানিত লেখকবৃন্দ তাঁদের মূল্যবান সময় ও শ্রম দিয়েছেন। আলেম-ওলামা ও শুভাকাজ্জীরা প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়েছেন। অনেকে তথ্য ও উপাত্ত দিয়ে সহযোগিতা করেছেন। কেউ সম্পাদনার কাজে, কেউ প্রুফ দেখার কাজে, কেউ প্রকাশনার বিভিন্ন পর্যায়ে সহযোগিতা করেছেন। আবার এমন অনেক মানুষ আছেন, যাঁদের নাম হয়তো এই গ্রন্থে উল্লেখ করা সম্ভব হয়নি, কিন্তু তাঁদের দোয়া ও উৎসাহ এই কাজের সঙ্গে অদৃশ্যভাবে জড়িয়ে আছে। মহান আল্লাহ তাঁদের সকলের এই খেদমত কবুল করুন এবং উত্তম প্রতিদান দান করুন।

এই গ্রন্থ প্রকাশের মধ্য দিয়ে আমাদের কাজ শেষ হয়নি; বরং নতুন একটি দায়িত্বের সূচনা হয়েছে। সীরাতুল্লাবী (ﷺ)-এর জ্ঞানকে শুধু গ্রন্থের পাতায় সীমাবদ্ধ না রেখে জীবনের প্রতিটি স্তরে বাস্তবায়ন করাই আমাদের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত। আমরা যেন নবীজির নামের প্রতি ভালোবাসাকে তাঁর সুন্নাহের অনুসরণে রূপান্তর করতে পারি। তাঁর প্রতি দরুদকে চরিত্রের সৌন্দর্যে রূপ দিতে পারি। তাঁর সীরাতের আলোকে নিজেদের পরিবারকে গড়ে তুলতে পারি। সমাজে ন্যায়, শান্তি, সহমর্মিতা ও মানবিকতার চর্চা করতে পারি।

আর এই মহতী ধারার মহান প্রবর্তক, আশেকে রাসূল, মুজাদ্দিদে মাহফিলে সীরাতুল্লাবী (সা.), হযরত শাহ মাওলানা হাফেজ আহমদ প্রকাশ শাহ সাহেব কেবলা চুনতী (রহ.)-এর প্রতি জানাই গভীর শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ও অফুরন্ত সালাম। মহান আল্লাহ তাআলা তাঁর এই সীরাতের খেদমতকে কবুল করুন, তাঁর মর্যাদা আরও বৃদ্ধি করুন এবং তাঁর প্রবর্তিত ঐতিহাসিক ১৯ দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক মাহফিলে সীরাতুল্লাবী (ﷺ)-এর ধারাকে যুগের পর যুগ, প্রজন্মের পর প্রজন্ম অব্যাহত রাখুন।

আমার পরম শ্রদ্ধেয় রাহবার হযরত শাহজাদা আলহাজ্ব মাওলানা আবদুল মালেক ইবনে মু. দিনার নাজাত সাহেবের প্রতি জানাই আন্তরিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা। তাঁর উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা এই প্রয়াসের পথচলায় আমার জন্য বিশেষ শক্তি হিসেবে কাজ করেছে।

মহান আল্লাহর দরবারে আমার একান্ত মোনাজাত—

হে আল্লাহ! এই ক্ষুদ্র প্রয়াসকে আপনার দরবারে কবুল করুন।

হে আল্লাহ! এই গ্রন্থের প্রতিটি অক্ষরকে সাদাকায়ে জারিয়ার উসিলা করে দিন। হে আল্লাহ! আমাদের অন্তরে আপনার প্রিয় হাবিব হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সত্যিকারের মহব্বত দান করুন।

হে আল্লাহ! তাঁর সুল্লাতকে আমাদের জীবনের আদর্শ বানিয়ে দিন।

হে আল্লাহ! চুনতীর এই ঐতিহাসিক সীরাতে ময়দানকে কিয়ামত পর্যন্ত দ্বীন, ইলম, আমল ও মহব্বতে রাসূলের আলো ছড়ানোর কেন্দ্র হিসেবে কবুল করুন।

হে আল্লাহ! এই গ্রন্থের লেখক, সম্পাদক, প্রকাশক, সহযোগী ও পাঠক—সকলকে আপনার রহমত ও মাগফিরাতের চাদরে আবৃত করুন।

পরিশেষে, মহান আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া আদায় করে এবং প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে অগণিত দরুদ ও সালাম পেশ করে এই ক্ষুদ্র প্রয়াস পাঠকের হাতে তুলে দিলাম।

যদি এই গ্রন্থের কোনো একটি প্রবন্ধ কোনো একজন মানুষের হৃদয়ে নবীপ্রেম জাগিয়ে তোলে, কোনো একজন তরুণকে সুল্লাতের পথে ফিরিয়ে আনে, কোনো একটি পরিবারকে নবীজির আদর্শে গড়ে উঠতে অনুপ্রাণিত করে—তাহলেই আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াস সার্থক হবে।

আল্লাহুম্মা আমিন, ইয়া রাক্বাল আলামিন।

অফুরন্ত সালাম ও শ্রদ্ধা

হযরত শাহ সাহেব কেবলা চুনতী (রহ.)-এর পবিত্র কদমে।

সোহেল তাজ

সম্পাদক

সীরত স্মারক - ২০২৬

১৯ দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক মাহফিলে সীরাতুননবী (ﷺ) চুনতী, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম ২০২৬ ইং

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

প্রধান পৃষ্ঠপোষকের বাণী

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ তাআলার জন্য, যিনি মানবজাতির হিদায়াতের জন্য যুগে যুগে নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন এবং সর্বশেষে বিশ্বমানবতার জন্য রহমতস্বরূপ প্রেরণ করেছেন আমাদের প্রিয় নবী, হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে। অসংখ্য দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক তাঁর পবিত্র সত্তা, তাঁর আহলে বাইত, সাহাবায়ে কেরাম এবং কিয়ামত পর্যন্ত তাঁর আদর্শ অনুসরণকারী সকল মুমিনের প্রতি।

মানবসভ্যতার ইতিহাসে এমন কিছু মহামানব আছেন, যাঁদের জীবন ও কর্ম যুগের সীমা অতিক্রম করে চিরন্তন প্রেরণার উৎসে পরিণত হয়েছে। কিন্তু হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবন শুধু প্রেরণার উৎস নয়; বরং মানবজাতির জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা, একটি পরিপূর্ণ আদর্শ এবং আল্লাহপ্রদত্ত সর্বোত্তম পথনির্দেশনা। তাঁর পবিত্র সীরাতে মানবজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আলোকিত করেছে—ইবাদত, আখলাক, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, অর্থনীতি, মানবিকতা, ন্যায়বিচার এবং আধ্যাত্মিকতার প্রতিটি স্তরে তিনি রেখে গেছেন অনুপম দৃষ্টান্ত।

এই মহান সত্যকে মানুষের সামনে তুলে ধরার লক্ষ্যেই প্রায় ছয় দশক আগে চট্টগ্রামের ঐতিহাসিক চুনতীর পবিত্র ভূমিতে যুগশ্রেষ্ঠ আলেম, অলিকুল শিরোমণি হযরত মাওলানা হাফেজ আহমদ প্রকাশ শাহ সাহেব কেবলা চুনতী (রহ.) সীরাতুননবী (ﷺ) মাহফিলের যে আলোকিত ধারা প্রবর্তন করেছিলেন, তা আজ এক মহীরুহে পরিণত হয়েছে। ৫৬তম আন্তর্জাতিক মাহফিলে সীরাতুননবী (ﷺ) সেই ঐতিহ্যেরই গৌরবোজ্জ্বল ধারাবাহিকতা, যা কেবল একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয়; বরং একটি জ্ঞানচর্চা, আত্মশুদ্ধি, দাওয়াত ও মানবিক মূল্যবোধ জাগরণের বিশ্বজনীন আন্দোলন।

এই ১৯ দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক মাহফিলের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো—রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর জীবন ও আদর্শকে বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক আলোচনার মাধ্যমে গভীরভাবে বিশ্লেষণ করা। প্রতিদিন একটি নির্দিষ্ট বিষয়কে কেন্দ্র করে দেশ-বিদেশের প্রখ্যাত আলেম, গবেষক, শিক্ষাবিদ ও

চিন্তাবিদগণ তাঁদের মূল্যবান বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন। তাঁদের আলোচনা শুধু ধর্মীয় আবেগের প্রকাশ নয়; বরং কুরআন, সুন্নাহ, ইতিহাস, গবেষণা এবং সমসাময়িক বাস্তবতার আলোকে সীরাতের শিক্ষা ও তাৎপর্য তুলে ধরার এক অনন্য প্রয়াস।

আজকের বিশ্ব এক অভূতপূর্ব পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। প্রযুক্তির বিস্ময়কর উন্ময়ন মানুষের জীবনকে সহজ করেছে, কিন্তু একই সঙ্গে নৈতিক সংকট, আত্মিক শূন্যতা, পারিবারিক ভাঙন, সামাজিক অস্থিরতা এবং মূল্যবোধের অবক্ষয়ও বাড়িয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে সীরাতুল্লাহী (ﷺ) কেবল অতীতের ইতিহাস নয়; বরং বর্তমান ও ভবিষ্যতের জন্য একটি কার্যকর পথনির্দেশনা। মানবজাতির সামনে যখন বিভ্রান্তি ও অনিশ্চয়তা দেখা দেয়, তখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর জীবনই হয়ে ওঠে সত্য ও কল্যাণের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য মানদণ্ড।

মাহফিলের মঞ্চে উচ্চারিত প্রতিটি মূল্যবান আলোচনা হাজারো মানুষের হৃদয়কে স্পর্শ করেছে। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মৌখিক বক্তব্য হারিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। তাই এই আলোচনা, গবেষণা ও চিন্তাধারাগুলোকে সংরক্ষণ করে গ্রন্থাকারে প্রকাশের উদ্যোগ নিঃসন্দেহে একটি ঐতিহাসিক ও দূরদর্শী পদক্ষেপ। আমি বিশ্বাস করি, এই সংকলন ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি মূল্যবান জ্ঞানভাণ্ডারে পরিণত হবে।

একটি জাতির বুদ্ধিবৃত্তিক ঐতিহ্য কেবল তার স্থাপত্য, সংস্কৃতি বা রাজনৈতিক ইতিহাসে সীমাবদ্ধ নয়; বরং তার জ্ঞানচর্চা, গবেষণা এবং চিন্তার ধারাবাহিকতার মধ্যেই প্রকৃত পরিচয় নিহিত থাকে। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে এই গ্রন্থ শুধু একটি স্মারক প্রকাশনা নয়; এটি সীরাতভিত্তিক জ্ঞানচর্চার একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল। এখানে সংরক্ষিত প্রতিটি আলোচনা আগামী দিনের গবেষক, শিক্ষার্থী, আলেম, লেখক ও সাধারণ পাঠকের জন্য পথপ্রদর্শক হতে পারে।

বিশেষভাবে আমি তরুণ প্রজন্মের কথা উল্লেখ করতে চাই। আজকের যুবসমাজ তথ্যপ্রযুক্তির যুগে বাস করছে। তাদের সামনে অসংখ্য মতাদর্শ, চিন্তাধারা ও সাংস্কৃতিক প্রভাব প্রতিনিয়ত উপস্থিত হচ্ছে। এই বাস্তবতায়

তাদের সামনে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর জীবনাদর্শকে সুস্পষ্টভাবে উপস্থাপন করা সময়ের অন্যতম দাবি। কারণ সীরাতে কেবল অতীতের কাহিনি নয়; এটি চরিত্র গঠনের শিক্ষা, নেতৃত্বের শিক্ষা, মানবিকতার শিক্ষা এবং আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক দৃঢ় করার শিক্ষা।

এই গ্রন্থের মাধ্যমে একজন পাঠক রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর জীবন ও শিক্ষাকে নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে জানার সুযোগ পাবেন। তিনি উপলব্ধি করতে পারবেন, কীভাবে একজন এতিম শিশু বিশ্বমানবতার সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক ও পথপ্রদর্শকে পরিণত হলেন; কীভাবে তিনি বিভক্ত, সংঘাতপূর্ণ ও অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত একটি সমাজকে জ্ঞান, ন্যায়, মানবতা ও আলোর সমাজে রূপান্তরিত করেছিলেন; এবং কীভাবে তাঁর শিক্ষা আজও পৃথিবীর প্রতিটি মানুষের জন্য সমানভাবে প্রাসঙ্গিক।

আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, এই সংকলন শুধু বাংলা ভাষাভাষী পাঠকদের জন্য নয়; বরং বিশ্বব্যাপী সীরাতে গবেষণা ও ইসলামী চিন্তাচর্চার ক্ষেত্রেও একটি উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে সক্ষম হবে। ভবিষ্যতে যদি এই আলোচনাগুলো বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়, তাহলে চুনতীর এই ঐতিহাসিক সীরাতে আন্দোলনের বার্তা বিশ্বের আরও বিস্তৃত পরিসরে পৌঁছে যাবে।

এই মহৎ উদ্যোগ বাস্তবায়নের জন্য আমি সম্পাদকমণ্ডলী, সংকলক, গবেষক, লেখক, প্রফরিডার, প্রকাশনা-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং মাহফিলের সম্মানিত আলোচকদের আন্তরিক অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা জানাই। তাঁদের নিষ্ঠা, মেধা ও পরিশ্রমের ফলেই এই জ্ঞানভিত্তিক উদ্যোগ বাস্তব রূপ পেয়েছে। একই সঙ্গে আমি সেই অসংখ্য শুভানুধ্যায়ী, দাতা, স্বেচ্ছাসেবক ও রাসূলপ্রেমিক মানুষের প্রতিও কৃতজ্ঞ, যাদের ভালোবাসা ও সহযোগিতায় এই মাহফিল বছরের পর বছর সফলভাবে পরিচালিত হয়ে আসছে।

আমাদের মনে রাখতে হবে, রাসূলপ্রেম শুধু আবেগের বিষয় নয়; এটি দায়িত্বেরও বিষয়। প্রকৃত রাসূলপ্রেম তখনই পরিপূর্ণতা লাভ করে, যখন আমরা তাঁর আদর্শকে নিজেদের জীবনে বাস্তবায়ন করি। এই গ্রন্থের প্রতিটি পৃষ্ঠা পাঠকের হৃদয়ে সেই দায়িত্ববোধ জাগ্রত করুক—এই আমার প্রত্যাশা। আমি মহান আল্লাহ তাআলার দরবারে দোয়া করি, তিনি যেন এই গ্রন্থকে

কবুল করেন, এর মাধ্যমে অসংখ্য মানুষের হৃদয়ে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ভালোবাসা বৃদ্ধি করেন এবং আমাদের ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে তাঁর সুন্যাতের আলো প্রতিষ্ঠিত করেন। এই গ্রন্থ যেন জ্ঞান, হিদায়াত ও আত্মশুদ্ধির এক স্থায়ী সাদাকায়ে জারিয়ায় পরিণত হয়।

পরিশেষে, ১৯ দিনব্যাপী ৫৬তম আন্তর্জাতিক মাহফিলে সীরাতুননবী (ﷺ)-এর বিষয়ভিত্তিক আলোচনা সংকলন করে প্রকাশিত এই মহামূল্যবান গ্রন্থের সর্বাপেক্ষা সফলতা কামনা করছি। মহান আল্লাহ তাআলা যেন এটিকে বিশ্বব্যাপী সীরাতচর্চার একটি নির্ভরযোগ্য উৎস হিসেবে কবুল করেন এবং এর মাধ্যমে অসংখ্য মানুষকে সত্য, সৌন্দর্য ও কল্যাণের পথে পরিচালিত করেন।

আল্লাহুমা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আ-লি সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদ।

ওয়ামা তাওফীকি ইল্লা বিল্লাহ।

শাহজাদা আলহাজ্জ মাওলানা আব্দুল মালেক মুহাম্মদ ইবনে দিনার নাজাত
প্রধান পৃষ্ঠপোষক

সীরত স্মারক - ২০২৬

সাংগঠনিক সম্পাদক

মোতাওয়াল্লী কমিটি

আন্তর্জাতিক মাহফিলে সীরাতুননবী (ﷺ), চুনতী, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

আহ্লায়কের বাণী

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ তাআলার জন্য, যিনি আমাদেরকে ঈমান, ইসলাম ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মত হওয়ার সৌভাগ্য দান করেছেন। অগণিত দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক বিশ্বমানবতার মুক্তির দূত, রহমাতুল্লিল আলামিন, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি; তাঁর পবিত্র আহলে বাইত ও সাহাবায়ে কেরামের প্রতি।

সীরাতুন্নবী (ﷺ) মুসলমানের জীবনের এমন এক অবিচ্ছেদ্য অধ্যায়, যার সঙ্গে ঈমান, ভালোবাসা, আদর্শ ও আত্মপরিচয় গভীরভাবে সম্পৃক্ত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন কেবল ইতিহাসের একটি উজ্জ্বল অধ্যায় নয়; বরং তা মানবজীবনের সর্বক্ষেত্রে অনুসরণীয় এক পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। মহান আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেছেন—

“নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ।” এই ঐশী ঘোষণার আলোকে সীরাতচর্চা কেবল ধর্মীয় জ্ঞানার্জনের বিষয় নয়; বরং ব্যক্তি ও সমাজজীবনকে সত্য, ন্যায়, সৌন্দর্য, মানবিকতা ও আল্লাহভীতির ভিত্তিতে গড়ে তোলার অন্যতম প্রধান মাধ্যম।

চট্টগ্রামের লোহাগাড়া উপজেলার চুনতী দীর্ঘদিন ধরে সীরাতুন্নবী (সা.)-এর আলোচনা, নবীপ্রেম ও দ্বীনি জ্ঞানচর্চার এক ঐতিহাসিক প্রাঙ্গণ হিসেবে পরিচিত। আশেক রাসূল, মুজাদ্দিদে মাহফিলে সীরাতুন্নবী (সা.), হযরত শাহ মাওলানা হাফেজ আহমদ প্রকাশ শাহ সাহেব কেবলা চুনতী (রহ.)-এর দূরদর্শী চিন্তা, ত্যাগ ও সাধনার ফসল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত ১৯ দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক মাহফিলে সীরাতুন্নবী (সা.) আজ একটি ঐতিহাসিক ধারায় পরিণত হয়েছে।

একটি দীর্ঘ সময় ধরে এই মাহফিলের মধ্যে দেশ-বিদেশের বরণ্য আলেম-ওলামা, গবেষক, চিন্তাবিদ ও জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিবর্গ সীরাতুন্নবী (সা.)-এর বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করে আসছেন। তাঁদের বক্তব্যে উঠে এসেছে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পবিত্র জীবন, তাঁর অনুপম চরিত্র, দাওয়াতি প্রজ্ঞা, পারিবারিক আদর্শ, সামাজিক ন্যায়বিচার, মানবিকতা, শান্তি, সম্প্রীতি, সুন্নাতের গুরুত্ব এবং উম্মতের প্রতি তাঁর সীমাহীন দরদ।

এই দীর্ঘ ঐতিহ্যের ৫৬তম পর্বে এসে সীরাতের বিষয়ভিত্তিক আলোচনাগুলোকে লিখিতভাবে সংরক্ষণ করে একটি স্মারক গ্রন্থ প্রকাশের উদ্যোগ নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়।

মাহফিলের ময়দানে উচ্চারিত মূল্যবান বক্তব্যের একটি বড় অংশ শ্রোতাদের হৃদয়ে স্থান করে নেয়; কিন্তু সময়ের প্রবাহে মৌখিক আলোচনা অনেক সময় হারিয়ে যায়। একটি প্রজন্মের স্মৃতি আরেক প্রজন্মের কাছে সম্পূর্ণভাবে পৌঁছায় না। তাই গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা ও চিন্তাধারাকে লিখিতভাবে সংরক্ষণ করা আমাদের দায়িত্ব।

১৯ দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক মাহফিলে আলোচিত বিভিন্ন বিষয় থেকে নির্বাচিত প্রবন্ধ ও বিষয়ভিত্তিক আলোচনা নিয়ে এই সংকলন প্রস্তুত করা হয়েছে। এতে হয়তো মাহফিলের সকল আলোচনা স্থান পায়নি; কিন্তু সীরাতের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দিককে লিখিতভাবে সংরক্ষণের যে প্রয়াস এখানে নেওয়া হয়েছে, তা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য মূল্যবান হয়ে উঠবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

একটি গ্রন্থ কখনো শুধু কিছু কাগজের সমষ্টি নয়। একটি ভালো গ্রন্থ একটি সময়ের চিন্তা, একটি প্রজন্মের অনুভূতি এবং একটি ঐতিহ্যের লিখিত দলিল হয়ে উঠতে পারে। সে দৃষ্টিকোণ থেকে এই স্মারক গ্রন্থকে আমি চুনতীর সীরাত-ঐতিহ্যের একটি ক্ষুদ্র লিখিত স্মারক হিসেবে বিবেচনা করি।

বর্তমান বিশ্ব নানা সংকট ও অস্থিরতার মধ্য দিয়ে অতিক্রম করছে। প্রযুক্তিগত উন্নতি মানুষের জীবনকে সহজ করেছে, কিন্তু মানুষের অন্তরের প্রশান্তি সবসময় নিশ্চিত করতে পারেনি। সামাজিক যোগাযোগ বেড়েছে, অথচ পারস্পরিক সহমর্মিতা অনেক ক্ষেত্রে কমেছে। জ্ঞান ও তথ্যের বিস্তার ঘটেছে, কিন্তু নৈতিকতার সংকটও প্রকট হয়েছে।

এমন সময়ে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জীবন ও আদর্শের দিকে ফিরে তাকানোর প্রয়োজন অপরিসীম।

তিনি আমাদের শিখিয়েছেন-ক্ষমতার সর্বোচ্চ অবস্থানেও বিনয়ী হতে হয়; প্রতিপক্ষের প্রতিও ন্যায্যবিচার করতে হয়; দুর্বল মানুষের পাশে দাঁড়াতে হয়; প্রতিবেশীর অধিকার রক্ষা করতে হয়; পরিবারকে ভালোবাসতে হয়; অসহায়কে সহযোগিতা করতে হয়; এবং সর্বাবস্থায় আল্লাহর ওপর নির্ভর করতে হয়।

তাঁর জীবন ছিল কুরআনের বাস্তব প্রতিচ্ছবি। তাঁর চরিত্রে ছিল দয়া, ক্ষমা, সত্যবাদিতা, আমানতদারি, সাহস, ধৈর্য, প্রজ্ঞা ও ন্যায়বিচারের অপূর্ব সমন্বয়।

তাই সীরাতুন্নবী (সা.)-এর আলোচনা যত বেশি হবে, সমাজে নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধের চর্চার সম্ভাবনাও তত বাড়বে-ইনশাআল্লাহ।

আজকের তরুণ প্রজন্ম আগামী দিনের সমাজ ও রাষ্ট্রের নেতৃত্ব দেবে। তাদের হাতে ভবিষ্যতের দায়িত্ব। তাই তাদের সামনে সঠিক আদর্শ তুলে ধরা আমাদের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব।

আমরা চাই, আমাদের তরুণরা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জীবন সম্পর্কে জানুক, তাঁর চরিত্র সম্পর্কে জানুক, তাঁর সুনাত সম্পর্কে জানুক এবং তাঁর আদর্শকে নিজেদের জীবনের অংশ করে তুলুক।

শুধু আবেগ দিয়ে নবীপ্রেমের দাবি যথেষ্ট নয়; নবীপ্রেমের সবচেয়ে সুন্দর প্রকাশ হলো তাঁর আদর্শ অনুসরণ করা। সত্য বলা, আমানত রক্ষা করা, অন্যের অধিকার সম্মান করা, পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণ করা, পরিবার ও সমাজের প্রতি দায়িত্বশীল হওয়া-এসবই নবীজির শিক্ষা।

এই স্মারক গ্রন্থ যদি নতুন প্রজন্মের একজন পাঠককেও রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জীবন সম্পর্কে আরও জানতে আগ্রহী করে তোলে, একটি সুনাত পালনে উদ্বুদ্ধ করে এবং তাঁর চরিত্র অনুসরণের সংকল্পে দৃঢ় করে-তাহলেই এই উদ্যোগ সার্থক হবে। এই মহতী আয়োজনের প্রবর্তক হযরত শাহ মাওলানা হাফেজ আহমদ প্রকাশ শাহ সাহেব কেবলা চুনতী (রহ.)-এর অবদান স্মরণ না করে চুনতীর সীরাতের ইতিহাস আলোচনা করা সম্ভব নয়।

তিনি যে সময়ে এই মহতী উদ্যোগের সূচনা করেছিলেন, তখন এত দীর্ঘ সময় ধরে এত বৃহৎ পরিসরে সীরাতচর্চার আয়োজন করা সহজ ছিল না। তাঁর নিষ্ঠা, ত্যাগ, দূরদর্শিতা ও মহব্বতে রাসূলের অনুপ্রেরণায় যে বীজ রোপিত হয়েছিল, তা আজ একটি বিশাল ঐতিহ্যে পরিণত হয়েছে।

তাঁর সেই স্বপ্ন ও সাধনার প্রতি সম্মান জানানো মানে শুধু তাঁকে স্মরণ করা নয়; বরং তাঁর প্রবর্তিত সীরাতচর্চার ধারাকে যথাযথভাবে এগিয়ে নেওয়া। মহান আল্লাহ তাআলা তাঁর এই খেদমত কবুল করুন, তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধি করুন এবং তাঁর রূহকে শান্তি ও নূরে পরিপূর্ণ করুন-আমিন। এই স্মারক গ্রন্থ প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণের জন্য সম্পাদককে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন আলেম-ওলামার সঙ্গে যোগাযোগ করে প্রবন্ধ

সংগ্রহ, বিষয় নির্বাচন, সম্পাদনা ও সংকলনের যে শ্রমসাধ্য কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে, তা নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবি রাখে। একই সঙ্গে সম্মানিত লেখকবৃন্দ, আলেম-ওলামা, গবেষক, প্রকাশনা-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং যাঁরা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এই গ্রন্থ প্রকাশে সহযোগিতা করেছেন-সকলের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। মহান আল্লাহ তাঁদের প্রত্যেকের এই খেদমত কবুল করুন এবং উত্তম প্রতিদান দান করুন।

আমি প্রত্যাশা করি, এই স্মারক গ্রন্থ একটি বিচ্ছিন্ন প্রকাশনা হিসেবে সীমাবদ্ধ থাকবে না; বরং চুনতীর সীরাতচর্চার দীর্ঘ ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও বিকাশের ক্ষেত্রে এটি একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা করবে।

ভবিষ্যতে ১৯ দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক মাহফিলে সীরাতুননবী (সা.)-এর বিভিন্ন বছরের আলোচনাগুলো আরও বৃহৎ পরিসরে সংগ্রহ, সম্পাদনা ও প্রকাশের উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে। গবেষক ও শিক্ষার্থীদের জন্য একটি সমৃদ্ধ সীরাত আর্কাইভ গড়ে তোলার চিন্তাও করা যেতে পারে। এতে চুনতীর ঐতিহাসিক সীরাত মাহফিলের জ্ঞানভাণ্ডার দেশ-বিদেশের পাঠক ও গবেষকদের কাছে আরও সহজে পৌঁছাবে। আজকের একটি ছোট উদ্যোগ আগামী দিনের একটি বৃহৎ ঐতিহ্যের ভিত্তি হয়ে উঠতে পারে। এই প্রত্যাশাই আমাদের এগিয়ে চলার প্রেরণা।

পরিশেষে মহান আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করি-তিনি যেন এই গ্রন্থকে কবুল করেন এবং এর মাধ্যমে অসংখ্য মানুষের অন্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহব্বত বৃদ্ধি করেন। আমাদের জীবনকে তাঁর সুন্নাতের আলোয় আলোকিত করুন এবং তাঁর আদর্শকে ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজজীবনে বাস্তবায়ন করার তাওফিক দান করুন।

হে আল্লাহ! চুনতীর এই ঐতিহাসিক সীরাতের ময়দানকে কবুল করুন।

হে আল্লাহ! এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল খেদমতগারকে কবুল করুন।

হে আল্লাহ! হযরত শাহ সাহেব কেবলা চুনতী (রহ.)-এর প্রবর্তিত এই সীরাতের ধারা কিয়ামত পর্যন্ত জারি রাখুন। হে আল্লাহ! এই স্মারক গ্রন্থকে ইলম, আমল, হেদায়াত ও মহব্বতে রাসূলের মাধ্যম হিসেবে কবুল করুন। আল্লাহুমা আমিন, ইয়া রাব্বাল আলামিন।

আহ্বায়ক

সীরত স্মারক - ২০২৬, প্রকাশনা উপ-কমিটি

১৯ দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক মাহফিলে সীরাতুননবী (ﷺ) ২০২৬ ইং
চুনতী, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।

রোগী ও মানবসেবার ফজিলত ড. মুহাম্মদ ঈসা শাহেদী

(ইসলামের দৃষ্টিতে মানবসেবার গুরুত্ব, রোগী সেবার মর্যাদা এবং কুরআন-হাদিসের আলোকে এর ফজিলত)

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা, যা মানুষের ব্যক্তিগত ইবাদতের পাশাপাশি সামাজিক দায়িত্ব ও মানবকল্যাণের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে। আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হলো তাঁর সৃষ্টির সেবা ও কল্যাণ সাধন করা। ইসলাম শুধু নামাজ, রোজা, হজ ও যাকাতের শিক্ষা দেয়নি; বরং অসহায়, দরিদ্র, রোগাক্রান্ত ও বিপদগ্রস্ত মানুষের পাশে দাঁড়ানোকে ঈমানের অন্যতম পরিচয় হিসেবে ঘোষণা করেছে।

রোগী ও মানবসেবা এমন একটি মহৎ ইবাদত, যার মাধ্যমে মানুষ আল্লাহর নৈকট্য লাভ করে, সমাজে ভালোবাসা ও সহমর্মিতা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং মানবতার প্রকৃত সৌন্দর্য প্রকাশ পায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজে অসুস্থদের খোঁজখবর নিতেন, তাঁদের সান্ত্বনা দিতেন এবং সাহায্যে কেরামকে রোগী ও অসহায় মানুষের সেবায় উৎসাহিত করতেন। তাই একজন প্রকৃত মুসলমান কখনো শুধু নিজের ইবাদতে সীমাবদ্ধ থাকে না; বরং মানুষের কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত রাখে।

ইসলামের দৃষ্টিতে মানবসেবার গুরুত্ব, রোগী সেবার মর্যাদা, কুরআন-হাদিসের আলোকে এর ফজিলত, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক উপকারিতা, বর্তমান সমাজে এর প্রয়োজনীয়তা এবং ব্যক্তি, পরিবার ও রাষ্ট্রের কাঠামো নির্মাণে অপরিসীম।

মানবসেবার পরিচয়

মানবসেবা বলতে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে মানুষের শারীরিক, মানসিক, আর্থিক ও সামাজিক কল্যাণে আন্তরিকভাবে কাজ করাকে বোঝায়। ক্ষুধার্তকে খাদ্য প্রদান, অসুস্থ ব্যক্তির সেবা, গরিবের সাহায্য, এতিমের লালন-পালন, বিপদগ্রস্তের পাশে দাঁড়ানো, জ্ঞান দান এবং মানুষের কষ্ট লাঘবের সব প্রচেষ্টাই মানবসেবার অন্তর্ভুক্ত।

ইসলামে মানবসেবা কেবল সামাজিক দায়িত্ব নয়; বরং এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। কারণ আল্লাহর বান্দার উপকার করা মানে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের পথ সুগম করা।

রোগী সেবার পরিচয়

রোগী সেবা বলতে অসুস্থ ব্যক্তির শারীরিক চিকিৎসার পাশাপাশি মানসিক সাহায্য, আর্থিক সহায়তা, প্রয়োজনীয় পরিচর্যা, দোয়া এবং সুস্থতার জন্য আন্তরিক সহযোগিতা করাকে বোঝায়।

ইসলামে রোগীর সেবা শুধু চিকিৎসকের দায়িত্ব নয়; বরং পরিবার, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী এবং সমাজের প্রতিটি সদস্যের ওপর এটি একটি নৈতিক ও ধর্মীয় দায়িত্ব।

আল-কুরআনের আলোকে মানবসেবার গুরুত্ব

আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَاَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۚ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ
بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ

অর্থ: তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো এবং তাঁর সঙ্গে কাউকে শরিক করো না। পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, এতিম, মিসকীন, নিকটবর্তী ও দূরবর্তী প্রতিবেশী, সঙ্গী এবং মুসাফিরের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করো।”

(সূরা আন-নিসা: ৩৬) এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা ইবাদতের সঙ্গে মানবসেবাকে একত্রে উল্লেখ করেছেন, যা এর গুরুত্বকে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করে। আল্লাহ তাআলা আরও বলেন وَيُؤْتِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ অর্থ: “তারা নিজেদের অভাব থাকা সত্ত্বেও অন্যদের অগ্রাধিকার দেয়।” (সূরা আল-হাশর: ৯) এ আয়াত আমাদেরকে নিঃস্বার্থ মানবসেবার শিক্ষা দেয়।

রোগীর প্রতি ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি

রোগ মানুষের জন্য একটি পরীক্ষা। অসুস্থ ব্যক্তির পাশে দাঁড়ানো, তাকে সাহায্য দেওয়া এবং সুস্থতার জন্য দোয়া করা অত্যন্ত সওয়াবের কাজ। আল্লাহ তাআলা বলেন إِذَا مَرَضْتَ فَهُوَ يَشْفِيكَ অর্থ: আমি যখন অসুস্থ হই, তখন তিনিই (আল্লাহ) আমাকে সুস্থ করেন। (সূরা আশ-শু'আরা: ৮০) এ আয়াত আমাদের শিক্ষা দেয় যে, প্রকৃত আরোগ্যদাতা একমাত্র আল্লাহ। তাই চিকিৎসার পাশাপাশি আল্লাহর ওপর ভরসা ও দোয়ার গুরুত্ব অপরিসীম।

হাদিসে রোগী সেবার ফজিলত

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন مَنْ عَادَ مَرِيضًا لَمْ يَزَلْ فِي خُرْفَةِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَرْجَعَ অর্থ:যে ব্যক্তি কোনো রোগীকে দেখতে যায়, সে ফিরে না আসা পর্যন্ত জান্নাতের ফলবাগিচায় অবস্থান করতে থাকে।” (সহিহ মুসলিম)। এই হাদিস প্রমাণ করে যে, রোগী দেখতে যাওয়া শুধু সামাজিক সৌজন্য নয়; বরং জান্নাত লাভের অন্যতম আমল। আরেক হাদিসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ অর্থ:যে ব্যক্তি কোনো মুমিনের একটি দুঃখ-কষ্ট দূর করবে, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার একটি কষ্ট দূর করে দেবেন।” (সহিহ মুসলিম), অসুস্থ মানুষের কষ্ট লাঘব করা এই হাদিসের অন্যতম প্রতিপাদ্য। কিয়ামতের দিন আল্লাহর ঘোষণা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা বলবেন— হে আদম সন্তান! আমি অসুস্থ ছিলাম, তুমি আমাকে দেখতে আসনি। বান্দা বলবে, “হে আমার রব! আপনি তো বিশ্বজগতের প্রতিপালক, আমি কীভাবে আপনাকে দেখতে যেতাম, আপনার সেবা করতাম?” আল্লাহ বলবেন, তুমি কি জানতে না যে, আমার অমুক বান্দা অসুস্থ ছিল? যদি তুমি তাকে দেখতে যেতে, তবে সেখানে আমাকে পেতে। (সহিহ মুসলিম), এই হাদিস রোগী সেবার মর্যাদাকে সর্বোচ্চ স্তরে উন্নীত করেছে।

মানবসেবা সর্বোত্তম ইবাদত

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন اللَّهُ أَرْحَمُ النَّاسِ إِلَى النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ অর্থ: আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় মানুষ সেই, যে মানুষের সবচেয়ে বেশি উপকার করে। (আল-মুজামুল আওসাত, তাবারানী) এই হাদিস থেকে বোঝা যায়, মানুষের উপকার করা আল্লাহর নিকট অত্যন্ত প্রিয় আমল।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবনে রোগী ও মানবসেবা

রাসূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন মানবতার সর্বশ্রেষ্ঠ সেবক। তিনি ধনী-গরিব, মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে অসুস্থ মানুষের খোঁজ নিতেন। একবার এক ইহুদি বালক অসুস্থ হলে তিনি তাকে দেখতে যান। তাঁর স্নেহপূর্ণ আচরণে সেই বালক ইসলাম গ্রহণ করে। (সহিহ বুখারি) এ ঘটনা প্রমাণ করে, মানবসেবা ইসলামের দাওয়াতেরও একটি কার্যকর মাধ্যম।

সাহাবায়ে কেরামের আদর্শ

সাহাবায়ে কেরামও মানবসেবায় অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। হযরত আবু বকর (রা.) বৃদ্ধ, অসহায় ও অন্ধ মানুষের সেবা করতেন। হযরত উমর (রা.) রাতে ছদ্মবেশে বের হয়ে দরিদ্র পরিবারের খোঁজ নিতেন এবং নিজ হাতে খাদ্য বহন করে তাঁদের কাছে পৌঁছে দিতেন। এসব ঘটনা ইসলামের মানবিক চেতনার বাস্তব প্রতিফলন।

মানবসেবার উপকারিতা

- আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জিত হয়।
- গুনাহ মাফের আশা সৃষ্টি হয়।
- সমাজে ভ্রাতৃত্ব ও ভালোবাসা প্রতিষ্ঠিত হয়।
- মানুষের দোয়া ও ভালোবাসা অর্জিত হয়।
- জান্নাত লাভের পথ সুগম হয়।
- আত্মকেন্দ্রিকতা দূর হয়ে দয়া ও সহমর্মিতা বৃদ্ধি পায়।
- রোগীর হক আদায় ও পরিচর্যার আদব সৃষ্টি হয়।

ইসলাম অসুস্থ ব্যক্তির কিছু মৌলিক অধিকার নির্ধারণ করেছে। একজন মুসলমানের উচিত যথাসম্ভব এসব অধিকার আদায় করা।

১. রোগীকে দেখতে যাওয়া (ইয়াদাতুল মারীদ)

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন

حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ ... وَإِذَا مَرَضَ فَعُدُّهُ

অর্থ: এক মুসলমানের ওপর অপর মুসলমানের ছয়টি অধিকার রয়েছে... সে অসুস্থ হলে তাকে দেখতে যাওয়া।” (সহিহ মুসলিম) রোগীকে দেখতে যাওয়া শুধু সৌজন্য নয়; এটি মুসলমানের পারস্পরিক অধিকার।

২. রোগীকে সন্তুহা দেওয়া

রোগীর পাশে বসে তাকে আল্লাহর রহমতের আশা দেওয়া, ধৈর্যের উপদেশ দেওয়া এবং হতাশ না হতে উৎসাহিত করা সুন্নত। রাসূলুল্লাহ ﷺ রোগীর কাছে গেলে বলতেন اللَّهُ إِنِّ شَاءَ الْأَرْثُ: ভয়ের কিছু নেই। ইনশাআল্লাহ এ রোগ তোমার জন্য পাপমুক্তির মাধ্যম হবে।” (সহিহ বুখারি)

৩. রোগীর জন্য দোয়া করা

রাসূলুল্লাহ ﷺ অসুস্থদের জন্য এ দোয়া করতেন,

اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ أَذْهِبِ الْبَأْسَ، اشْفِ أَنْتَ الشَّافِي، لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ، شِفَاءٌ لَا يُغَادِرُ سَقَمًا

অর্থ: হে মানুষের প্রতিপালক! কষ্ট দূর করুন। আপনিই আরোগ্যদানকারী। আপনার আরোগ্য ছাড়া কোনো আরোগ্য নেই। এমন আরোগ্য দান করুন, যাতে কোনো রোগ অবশিষ্ট না থাকে। (সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিম)

8. চিকিৎসার ব্যবস্থা করা

ইসলাম চিকিৎসা গ্রহণকে উৎসাহিত করেছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন
اَرْتَدَّوْا عِبَادَ اللَّهِ، فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ دَوَاءً
বান্দাগণ! চিকিৎসা গ্রহণ করো। কেননা আল্লাহ এমন কোনো রোগ সৃষ্টি করেননি, যার চিকিৎসা সৃষ্টি করেননি। (সুনান আবু দাউদ, জামে আত-তিরমিযী) এ হাদিস প্রমাণ করে, চিকিৎসা গ্রহণ আল্লাহর ওপর ভরসার পরিপন্থী নয়; বরং সুল্লাহসম্মত। ইসলামে মানবসেবা কেবল রোগীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং এতিম, বিধবা, প্রতিবন্ধী, বৃদ্ধ ও দরিদ্র মানুষের সেবাও অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ কাজ। আল্লাহ তাআলা বলেন
وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا
অর্থ: তারা আল্লাহর ভালোবাসায় মিসকীন, এতিম ও বন্দীকে খাদ্য দান করে।” (সূরা আল-ইনসান: ৮), এ আয়াত সমাজের দুর্বল মানুষের পাশে দাঁড়ানোর নির্দেশ দেয় বিশেষ করে অনুদানের ও বস্ত্রদানের প্রতি।

প্রতিবেশীর সেবা

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন
مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُؤَرَّثُهُ
অর্থ: জিবরাইল (আ.) প্রতিবেশীর অধিকার সম্পর্কে আমাকে এত বেশি সুপারিশ করেছেন যে, আমি ধারণা করেছিলাম তিনি হয়তো প্রতিবেশীকেও উত্তরাধিকারী বানিয়ে দেবেন। (সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিম), বস্ত্রত অসুস্থ প্রতিবেশীর খোঁজ নেওয়া, তার প্রয়োজনে সহযোগিতা করা ইসলামী চরিত্রের অংশ।

মানবসেবার সামাজিক উপকারিতা

মানবসেবা সমাজে বহু ইতিবাচক পরিবর্তন আনে— যেমন

১. ভ্রাতৃত্ব ও সম্প্রীতি বৃদ্ধি পায়।
২. ধনী-গরিবের বৈষম্য কমে।
৩. সমাজে পারস্পরিক ভালোবাসা ও বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত হয়।
৪. অপরাধ ও হিংসা কমে আসে।

৫. সামাজিক নিরাপত্তা ও মানবিক মূল্যবোধ শক্তিশালী হয়।

সুতরাং একটা সুন্দর ইসলামিক সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে মানুষ শান্তি উপভোগ করতে পারে।

মানবসেবার আধ্যাত্মিক উপকারিতা

- আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জিত হয়।
- গুনাহ মাফের আশা সৃষ্টি হয়।
- দোয়া কবুলের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়।
- হৃদয়ে দয়া ও নম্রতা সৃষ্টি হয়।
- জান্নাত লাভের পথ সহজ হয়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ অর্থ: যারা মানুষের প্রতি দয়া করে, পরম দয়ালু আল্লাহ তাদের প্রতি দয়া করেন।” (জামে আত-তিরমিযী)

বর্তমান সমাজে মানবসেবার প্রয়োজনীয়তা

বর্তমান যুগে নানা রোগব্যাদি, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, দারিদ্র্য, মানসিক অবসাদ এবং সামাজিক বৈষম্য বেড়ে চলেছে। অনেক মানুষ চিকিৎসার অভাবে কষ্ট পাচ্ছে, আবার অনেক বৃদ্ধ ও অসহায় ব্যক্তি একাকীত্বে জীবন কাটাচ্ছেন। এমন সময় ইসলামের মানবসেবার শিক্ষা আরও বেশি প্রাসঙ্গিক। এর পরিপ্রেক্ষিতে আজ আমাদের প্রয়োজন বিনামূল্যে চিকিৎসাসেবা সম্প্রসারণ। হাসপাতাল, এতিমখানা ও বৃদ্ধাশ্রমে স্বেচ্ছাসেবামূলক কার্যক্রম পরিচালনা। অসুস্থ ও দরিদ্র পরিবারের পাশে দাঁড়ানো। সমাজে সহমর্মিতা ও দয়ার সংস্কৃতি গড়ে তোলা। ব্যক্তি, পরিবার ও রাষ্ট্রের করণীয় ব্যক্তির করণীয় নিয়মিত রোগীর খোঁজ নেওয়া। দরিদ্র মানুষের চিকিৎসায় সহায়তা করা। রক্তদান ও সেবামূলক কাজে অংশগ্রহণ করা। মানুষের সঙ্গে সদাচরণ করা। পরিবারের করণীয় শিশুদের ছোটবেলা থেকেই মানবসেবার শিক্ষা দেওয়া। অসুস্থ আত্মীয়-স্বজনের যত্ন নেওয়া। পারিবারিকভাবে দান-সদকা ও সেবামূলক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করা।

রাষ্ট্রের করণীয়

দরিদ্র মানুষের জন্য সহজলভ্য চিকিৎসাব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

সরকারি হাসপাতালের মান উন্নয়ন করা।

প্রতিবন্ধী, বৃদ্ধ ও অসহায়দের জন্য কার্যকর সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

স্বৈচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানগুলোকে সহযোগিতা করা।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মানবসেবার অনুপম আদর্শ

রাসূলুল্লাহ ﷺ কখনো মানুষের কষ্টকে অবহেলা করেননি। তিনি ক্ষুধার্তকে আহার দিয়েছেন, অসুস্থকে দেখতে গিয়েছেন, এতিমের মাথায় স্নেহের হাত রেখেছেন, বিধবাকে সাহায্য করেছেন এবং দরিদ্রদের পাশে দাঁড়িয়েছেন। তিনি বলেছেন **النَّاسُ خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ** অর্থ: সর্বোত্তম মানুষ সেই, যে মানুষের সবচেয়ে বেশি উপকার করে।” (তাবারানী; অর্থটি ইসলামী নৈতিক শিক্ষায় সুপ্রসিদ্ধ), এ হাদিস মুসলিম জীবনের অন্যতম নীতি হওয়া উচিত।

আমাদের জন্য শিক্ষণীয় বিষয়

মানবসেবা ইসলামের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত।

রোগীকে দেখতে যাওয়া ও তার সেবা করা মহান সওয়াবের কাজ।

মানুষের কষ্ট লাঘব করা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের অন্যতম মাধ্যম।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবায়ে কেরাম মানবসেবার সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

একজন প্রকৃত মুসলমান নিজের ইবাদতের পাশাপাশি সমাজের কল্যাণেও আত্মনিয়োগ করেন।

রোগীর সেবা করা ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ সুন্নত ও ইবাদত।

চিকিৎসা গ্রহণ ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করা ইসলামের নির্দেশনা।

অসহায়, দরিদ্র ও প্রতিবন্ধীদের সাহায্য করা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের অন্যতম মাধ্যম।

মানবসেবা সমাজে শান্তি, সম্প্রীতি ও পারস্পরিক ভালোবাসা প্রতিষ্ঠা করে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আদর্শ অনুসরণ করে প্রত্যেক মুসলমানের উচিত নিজেকে মানবকল্যাণে নিয়োজিত করা।

রোগী ও মানবসেবা ইসলামের দৃষ্টিতে শুধু একটি সামাজিক কর্তব্য নয়; বরং এটি ঈমান, তাকওয়া ও মানবিকতার উজ্জ্বল প্রকাশ। কুরআন ও সুন্নাহ আমাদের শিক্ষা দেয় যে, আল্লাহর বান্দার সেবা করাই আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের অন্যতম সহজ ও মহৎ পথ। তাই প্রত্যেক মুসলমানের উচিত অসুস্থ, দরিদ্র, অসহায় ও বিপদগ্রস্ত মানুষের পাশে দাঁড়ানো এবং তাদের সেবাকে ইবাদত হিসেবে গ্রহণ করা। ইসলাম এমন একটি জীবনব্যবস্থা, যেখানে আল্লাহর ইবাদত এবং মানুষের সেবা পরস্পরের পরিপূরক। যে ব্যক্তি আন্তরিকভাবে রোগীর সেবা করে, অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ায়

এবং মানবতার কল্যাণে নিজেকে উৎসর্গ করে, সে আল্লাহর বিশেষ রহমত ও সম্ভৃষ্টির অধিকারী হয়। কুরআন ও সুন্নাহ আমাদের শেখায়, মানুষের কল্যাণে ব্যয় করা সময়, শ্রম ও সম্পদ কখনো বৃথা যায় না; বরং তা দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতার পাথেয় হয়ে থাকে।

আসুন, আমরা প্রত্যেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মহান আদর্শ অনুসরণ করে রোগী, দরিদ্র, এতিম, প্রতিবন্ধী ও সকল অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়াই এবং একটি দয়াময়, সহানুভূতিশীল ও মানবিক সমাজ গঠনে আত্মনিয়োগ করি।

উপরোক্ত হাদিস ও কুরআন দ্বারা বুঝা যায় রোগীর সেবা একবিরাট পুণ্যের কাজ। যেই পুণ্যটা একজন হৃদয়বান ডাক্তারই বেশী অর্জন করতে সক্ষম অন্যজনের তুলনায়।

লেখক : গবেষক ও প্রাবন্ধিক

রাসূল (সা.) এর যুদ্ধনীতি: মানবতা, সংযম ও শৃঙ্খলার ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত
প্রফেসর ড. আ.ক.ম. আবদুল কাদের

ভূমিকা:

'ইসলাম' শান্তির ধর্ম, বিশ্বজনীন শান্তি ও নিরাপত্তা বিধানের ধর্ম। আর এই ধর্মের ধারক ও বাহক হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর উপাধি হল 'রাহমাতুল লিল আলামীন'- বিশ্বজাহানের জন্য রহমতের আধার। তাঁর আবির্ভাব ঘটে আরবের উষর ধূসর মরু প্রান্তরে গোত্র ও জাতিগত দ্বন্দ্ব-সংঘাতে লিপ্ত জনপদে। দীর্ঘ চল্লিশটি বছর তিনি এই জনপদে অতিবাহিত করেন অত্যন্ত সম্মান ও মর্যাদা সহকারে, জাতীয় ঐক্য ও সংহতির প্রতীকরূপে। অতঃপর হেরা গুহায় তাঁর উপর ওহী নাযিল হলে আরবদের লালিত ধর্ম বিশ্বাসে কঠোর আঘাত হানা হয়। যার ফলশ্রুতিতে তাঁর সাথে শুরু হয় বিভিন্ন গোত্র ও কায়েমী স্বার্থবাদীদের দ্বন্দ্ব। এক পর্যায়ে শুরু হয় ঈমানের অগ্নি পরীক্ষা, তিনি এবং তাঁর নবদীক্ষিত অনুসারীদের উপর অত্যাচার-নির্যাতনের স্টিমরোলার। ফলে মাত্র তের বছর পর তিনি মহান আল্লাহর নির্দেশে পবিত্র মাতৃভূমি ত্যাগ করে মদীনা হিজরাত করেন। হিজরাত পরবর্তী মাত্র এক বছরের মধ্যেই শুরু হয় আরবের কুরাইশ ও অন্যান্য গোত্র এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের গোত্রসমূহের সাথে সশস্ত্র সংঘাত। এইসব সংঘাত-সংঘর্ষ এবং যুদ্ধ বিগ্রহে রাসূল (সা.) কর্তৃক অনুসৃত নীতিমালা পর্যালোচনা করাই বক্ষ্যমান প্রবন্ধের মূল প্রতিপাদ্য।

ইসলামে যুদ্ধের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

যুদ্ধ কোন আঘাতে গল্প কিংবা কল্প কাহিনী নয়। এটি হল রক্তের হোলিখেলা, মৃত্যুর বিভীষিকা, আহত কিংবা নিহতের করুণ আর্তনাদের প্রতিচ্ছবি, সন্তান হারানোর বেদনা, স্বামী হারানোর করুণ আর্তনাদ আর পিতৃ হারানোর শোকাচ্ছন্ন সন্তানের দীর্ঘশ্বাসের এক বাস্তব প্রতিকৃতি। তাই কোন ঠুনকো অজুহাতে যুদ্ধে জড়ানোর বিধান ইসলামে নেই। কেবল শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা, অশান্তি দূরীকরণ, ফিতনার মূলোৎপাটন এবং পরিপূর্ণরূপে দ্বীনের বিধান কায়েমের লক্ষ্যেই কেবল যুদ্ধ পরিচালনার অনুমোদন রয়েছে। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন:^১

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ

^১ . সূরা আল বাকারাহ: ১৯৩।

অর্থাৎ: আর তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করবে, যাতে কোন ফিতনা বিদ্যমান না থাকে এবং দ্বীন একমাত্র আল্লাহর জন্য হয়ে যায়।

পৃথিবীতে যে কোন মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ত্যাগ ও কুরবানীর প্রয়োজন। আর সমাজ হতে জুলুম-নিপীড়ন, অবিচার, অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা দূরীভূত করে এতে আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠার চেয়ে বড় কোন মহৎ উদ্দেশ্য আছে বলে মনে হয় না। সুতরাং সব ধরনের আধিপত্য নির্মূল করে জনগণের দ্বীন, জীবন, সম্পদ, সম্মান ও মানব মর্যাদা রক্ষা করা, জনমনে ভীতি ও ত্রাস দূর করে নিরাপত্তার ঝুঁকি হ্রাস করা, আত্মত্বরক্ষার নিশ্চয়তা বিধান করা এবং বহিঃশত্রুর আক্রমণ হতে দেশ ও মজলুম জনপদকে রক্ষা করাই ইসলামী জিহাদের মূল লক্ষ্য। মহান রব্বুল আলামীন ইরশাদ করেন: ২

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا.

অর্থাৎ: তোমাদের কী হলো; তোমরা কেন আল্লাহর পথে এবং সেইসব দুর্বল নর-নারী ও শিশুদের (রক্ষার) জন্য যুদ্ধ করছ না? যারা বলছে, হে আমাদের রব! অত্যাচারী অধিবাসী বিশিষ্ট এই জনপদ থেকে আমাদেরকে বের (উদ্ধার) কর। আর তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য একজন অভিভাবক দাও এবং তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য একজন সাহায্যকারী দাও।

ইসলামে যুদ্ধের সূচনা:

বাংলা ভাষায় যুদ্ধের প্রতিশব্দ হল সংগ্রাম, সমর, রণ, বিগ্রহ, লড়াই, সশস্ত্র-সংঘাত ইত্যাদি। রাসূল সা. এর হাদীসে এটি জিহাদ, কিতাল, গায়ওয়াহ, সারিয়াহ ইত্যাদি পরিভাষা হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। ৬২২ ঈসাব্দে মদীনাবী (সাঃ) মদীনা হিজরাতের পর মদীনা সনদের মাধ্যমে মদীনা একটি বহুজাতিক নগর রাষ্ট্রের মর্যাদা লাভ করে। আর এই সনদে বর্ণিত ধারার আলোকে মহানবী সা. এই নব প্রতিষ্ঠিত ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধান নির্বাহী মনোনীত হন। কিন্তু মক্কার কুরাইশরা তা সহজে মেনে নিতে পারে নি। ফলে তারা মদীনার প্রভাবশালী খায়রাজ গোত্রের নেতা আবদুল্লাহ ইবন উবাই-এর সাথে গোপনে ষড়যন্ত্র করে মদীনার উপকণ্ঠে অতর্কিত হামলা চালিয়ে লুটতরাজ করে চলে যায়। হিজরাত পূর্ববর্তী আকাবার শপথের পূর্ব

২. সূরা আন-নিসা: ৭৫।

পর্যন্ত কুরাইশদের সাথে সশস্ত্র যুদ্ধের অনুমতি ছিলনা। বরং শত নির্যাতনের মুখেও ধৈর্য ধারণ, দলীল প্রমাণ উপস্থাপন এবং হিকমাত ও উত্তম বাক্য ব্যয়ে ইসলামের প্রচার এবং লোকদেরকে আল্লাহর পথে আহবানের নির্দেশ ছিল। কিন্তু কাফির-মুশরিকের পক্ষ হতে মুসলমানদের উপর জুলুম-অত্যাচারের মাত্রা বৃদ্ধি এবং রাসূল সা. কে শহীদ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণের ফলে আল্লাহর পক্ষ হতে রাসূল সা. ও সাহাবীগণের প্রতি মাতৃভূমি ত্যাগ করে মদীনা হিজরাতের নির্দেশ ছিল। ইতোমধ্যে কাফিরদের সাথে বিচ্ছিন্ন কিছু সংঘর্ষ হলেও তা ছিলো কেবল আত্মরক্ষামূলক। কিন্তু কাফিরদের পক্ষ হতে মুসলমানদের উপর অত্যাচার-নির্যাতনের মাত্রা সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেলে মুসলমানদেরকে সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়ার এবং অন্যায় অত্যাচারের প্রতিশোধ গ্রহণের অনুমতি

প্রদান করে মহান রাব্বুল আলামীন এরশাদ করেন:°

أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَتِّلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ . الَّذِينَ أَخْرَجُوا مِن دِيَارِهِم بَغْيًا فَإِنَّمَا يُغِيرُ حَقًّا إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدَمَتْ صَوْمُعُ وَبِيعَ وَصَلَوْتُ وَمَسْجِدٌ يُذَكِّرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ .

অর্থাৎ যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হচ্ছে তাদেরকেও অনুরূপ (যুদ্ধ করার) অনুমতি দেয়া হল, কেননা তার মজলুম-নির্যাতিত। আর নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাদেরকে সাহায্য করতে সক্ষম। তারা সেই লোক যারা নিজেদের ঘর বাড়ী থেকে অন্যায়ভাবে বহিস্কৃত হয়েছে। তাদের অপরাধ ছিল শুধু এতটুকু যে, তারা বলতো, আমাদের রব হলেন আল্লাহ। আল্লাহ তায়ালা যদি এক দলকে অন্য দল দ্বারা প্রতিরোধ না করতেন তাহলে উপসনালয়গুলো, গীর্জাসমূহ এবং মসজিদসমূহ- যাতে অধিক পরিমাণে আল্লাহর যিকর করা হয়- চুরমার করে দেওয়া হতো। নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা সেইসব লোককে সাহায্য করবেন যারা তাঁর সাহায্যে এগিয়ে আসবে। বস্তুত আল্লাহ তায়ালা অত্যন্ত শক্তিশালী ও পরাক্রমশালী।

রাসূল (সা.) এর যুদ্ধনীতি:

রাসূল সা. কর্তৃক পরিচালিত যুদ্ধসমূহের উদ্দেশ্য কেবল প্রতিপক্ষের উপর বিজয় কেতন উভয়ীন করা কিংবা শত্রু পক্ষকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া ছিলনা।

° . সূরা আল-হাজ্জ: ৩৯-৪০।

বরং এর উদ্দেশ্য ছিল ইসলামের সুমহান বাণী প্রচার এবং সকল মতবাদের উপর ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা। আল্লাহ তায়ালা বলেন:^৪

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ

অর্থাৎ: তিনিই তাঁর রাসূলকে পথনির্দেশ ও সত্যদ্বীনসহ প্রেরণ করেছেন, সকল দ্বীনের উপর একে বিজয়ী করার জন্য, মুশরিকরা তা অপছন্দ করলেও।

ফলে শত্রু পক্ষের উপর চূড়ান্ত বিজয় লাভ করার পরেও রাসূল সা. আনন্দে উদ্বেলিত হননি। বরং সদা মহান আল্লাহর সমীপে আনুগত্যের মস্তক অবনত করেছেন, তাঁর উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে সীমাবদ্ধতার স্বীকৃতি দিয়েছেন। আর বিজিতদের প্রতি দেখিয়েছেন ক্ষমা, দয়া ও অনুগ্রহের অনুপম দৃষ্টান্ত। তিনি কখনো যুদ্ধের সূচনা করেন নি, কিন্তু যারা ইসলামের মূলোৎপাটনের জন্য সর্বশক্তি নিয়োজিত করেছিল তাদের দম্ব ও অহংকার চুরমার করে দিয়েছেন, যারা ইসলামের অগ্রযাত্রায় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল তাদের সমস্ত প্রয়াসকে নিশিহ্ন করে দিয়েছেন। যুদ্ধক্ষেত্রে নিখুঁত পরিচালনা, পাহাড়সম সংযম এবং শৃঙ্খলাবোধের অনন্য নজির তাঁর সাফল্যের মূলমন্ত্র হিসাবে বিশ্ববাসীর নিকট প্রতিভাত রয়েছে। নিম্নে রাসূল (সাঃ) এর যুদ্ধনীতি আলোকপাত করা হলো।

এক. রাসূল সা. কখনো যুদ্ধের সূচনা করেন নিঃ

রাসূল সা. ছিলেন দয়ার নবী, রহমতের নবী। তাঁর কোন পদক্ষেপ মানবতার বিরুদ্ধে যায় এমন কোন কাজ কিংবা আচরণ তাঁর নিকট থেকে প্রকাশিত হয় নি। মক্কী জীবনে তিনি ও তাঁর মহান সাহাবীগণ অনেক নির্যাতন সহ্য করেছেন, কিন্তু তাঁরা প্রতিশোধ গ্রহণ কিংবা প্রতিরোধ করার ইচ্ছা পোষণ করেননি। ইসলামের ইতিহাসে সবচাইতে বড় যুদ্ধ সংঘটিত হয় বদর প্রান্তরে। এখানে তিনি যুদ্ধ করতে যাননি বলে তাঁর প্রস্তুতি ছিল নেহায়েত সীমিত। কেবল আত্মতুরক্ষার জন্য সাথে ছিল যৎসামান্য তীর, ধনুক, বল্লম ও তরবারী। কিন্তু শত্রুপক্ষ সমুদ্র তীরবর্তী পথ ধরে বিকল্প পথে চলে যায়। আর গোয়েন্দা মারফত মক্কায় রাসূল সা. ও তাঁর সাহাবীগণের আগমনের সংবাদ দিয়ে দেয়। ফলে মক্কা হতে আগত বাহিনী (কুরাইশ এবং মুসলিম) মুখোমুখি হলেও রাসূল সা. প্রথমে আক্রমণ করেননি। বরং উতবাহ ইবনু

^৪ . সূরা আছ- ছাফা: ৯।

রাবী'আহ, শাইবাহ ইবনু রাবী'আহ এবং ওয়ালীদ ইবনু উতবাহ অত্রসর হয়ে তাদের সাথে সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হওয়ার আহবান জানায়। আর রাসূল সা. এর অনুমতিক্রমে এই আহ্বানে সাড়া দেন হামযাহ ইবনু আবদিল মুত্তালিব রা., আলী ইবনু আবী তালিব রা. ও উবায়দাহ ইবনুল হারিস রা.।^৭ দুই: যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার আগেই প্রতিপক্ষের ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে নিশ্চিত হতেন:

রাসূল সা. কোন জাতি-গোষ্ঠীর সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার আগেই প্রতিপক্ষের ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে অবগত হওয়া ব্যতীত তাদের সাথে যুদ্ধে জড়াতেন না। রাতের বেলা যুদ্ধক্ষেত্রে পৌঁছলে সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতেন সেখান থেকে আযানের আওয়াজ আসে কিনা। আযানের আওয়াজ শুনতে পেলে অভিযান পরিচালনা হতে বিরত থাকতেন। অন্যথা অভিযান পরিচালনা করতেন। খায়বার অভিযানের সময় এই পন্থা অনুসৃত হয়। প্রত্যুষে খায়বারের লোকজন প্রয়োজনীয় সামগ্রী নিয়ে কাজে বের হলে তারা রাসূল সা. ও তাঁর সহযোদ্ধাদের দেখে ভীত-বিহ্বল হয়ে পড়ে এবং নিজ নিজ দুর্গের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। এই দৃশ্য দেখে রাসূল সা. বলে উঠলেন:^৮

اللَّهُ أَكْبَرُ خَرَبْتُ خَيْبَرُ إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْدَرِينَ
আল্লাহ্ আকবার! খায়বারের পতন অনিবার্য। আমরা কোন জনপদের আঙ্গিনায় প্রবেশ করলে তাদের সকালটা মঙ্গলকর হয়না।

তিন: যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার আগেই সংশ্লিষ্ট পক্ষকে ইসলামের মৌলিক বিষয়ের দাওয়াত দিতেন:

রাসূল সা. অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিবাদমান গোত্র ও জাতিসমূহকে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দিতেন। হযরত মুআয ইবনু জাবাল রা. কে ইয়ামন গভর্ণর হিসেবে প্রেরণের প্রাক্কালে তিনি ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো ইয়ামনের অধিবাসীদের নিকট ধারাবাহিকভাবে তুলে ধরার নির্দেশনা প্রদান করেন। এছাড়াও তিনি রোমান সম্রাট হিরাক্লিয়াস, পারস্য সম্রাট কিসরা, মিশরের সম্রাট মুকাতকাস এবং ইথিওপিয়ার সম্রাট নাজ্জাশীর নিকট পত্র প্রদান করে তাঁদেরকে ইসলাম গ্রহণের আমন্ত্রণ জানান।

^৭ . সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং-২৬৬৫, কিতাবুল জিহাদ।

^৮ . সহীহ আল বুখারী, হাদীস নং-৬১০।

চার. অভিযান কোন দিকে পরিচালিত হবে কৌশলগত কারণে তা গোপন রাখতেন:

বিশিষ্ট সাহাবী হযরত কাব ইবনু মালিক রা. হতে বর্ণিত, রাসূল সা. অধিকাংশ ক্ষেত্রে কৌশলগত কারণে কোন দিকে অভিযান পরিচালিত হবে তার সঠিক তথ্য গোপন রাখতেন, যেন প্রতিপক্ষ আগাম সংবাদ পেয়ে পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করতে না পারে। তিনি কেবল তাবুক অভিযানের বিষয়টি আগে থেকেই প্রকাশ করেন। কারণ মৌসুমটি ছিল প্রচণ্ড গরমের, পথের দূরত্ব ছিল অনেক বেশী, আর এটি ছিল ফসল কাটার মৌসুম এবং অভিযানটি পরিচালিত হচ্ছিল একটি বৃহৎ শক্তির বিরুদ্ধে। আর আগে ভাগেই ঘোষণা প্রদানের উদ্দেশ্য ছিল, যাতে মুসলিম বাহিনী পরিপূর্ণ সামরিক ও মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারে।^৭

পাঁচ. যুদ্ধের কৌশল নিয়ে সাহাবীগণের সাথে পরামর্শ করতেন:

রাসূল সা. যুদ্ধের গুরুত্বপূর্ণ ও কৌশলগত দিক নিয়ে সাহাবীগণের সাথে পরামর্শ করতেন। বদর যুদ্ধ কোন স্থান হতে পরিচালিত হবে এ বিষয়ে আনসার সাহাবীগণ হতে মতামত গ্রহণ করেন। ওহুদ যুদ্ধ কি মদীনার অভ্যন্তর থেকে প্রতিহত করা হবে না কি মদীনার বাইরে গিয়ে পরিচালিত হবে তা সাহাবীগণের পরামর্শ নেন।^৮ এমন কি আহযাব যুদ্ধের প্রাক্কালে পরিখা খনন বিষয়েও সালমান আল ফারসীর রা. মতামত নেন।^৯ খায়বার দূর্গ বিধ্বংসী মেনজানিক সমরাস্ত্র ব্যাপারের বিষয়েও তিনি পরামর্শ গ্রহণ করেন।^{১০} আর যুদ্ধ বন্দীদের সাথে কোন ধরনের আচরণ করা হবে তা নিয়েও রাসূল সা. পরামর্শ গ্রহণ করতেন।^{১১}

ছয়. প্রতিপক্ষের খবরাখবর গ্রহণ ও গতিবিধি পর্যবেক্ষণের জন্য গোয়েন্দা নিয়োগ করতেন:

রাসূল সা. শত্রু পক্ষের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ এবং তাদের খবরাখবর গ্রহণের জন্য গোয়েন্দা নিয়োগ করতেন। আহযাব যুদ্ধে মক্কার সম্মিলিত বাহিনীর সামগ্রিক তৎপরতার খবরাখবর গ্রহণের জন্য যুবাইর রা. কে গোয়েন্দা

^৭. সহীহ আল বুখারী: হাদীস নং-২৯৪৭।

^৮. সহীহ আল বুখারী, হাদীস নং-৬৯৩৫।

^৯. ফতহুল বারী, ৭ম খন্ড, পৃ. ৩৯৩।

^{১০}. ইবনু হিশাম, সীরাতে, ২য় খন্ড, পৃ. ১১২।

^{১১}. মুসনাদে আহমদ ৬/১৩৮: হাদীস নং-৩৬৩২।

নিয়োগ করেন।^{১২} এ ছাড়াও গোয়েন্দা মারফত খবর পেয়ে তিনি সারাহ নান্নী জনৈক নারী মারফত হাতিব ইবনু আবী বালতা'আহ রা. কর্তৃক প্রেরিত পত্র উদ্ধারের জন্য গোয়েন্দা হিসাবে আলী রা. ও যুবাইর রা. কে প্রেরণ করেন।^{১৩}

সাত. যুদ্ধ এড়ানোর জন্য শত্রুপক্ষের সাথে সন্ধিস্থাপন করতেন:

রাসূল সা. যুদ্ধ পরিহার করার জন্য সম্ভাব্য সকল উপায়-উপকরণ অবলম্বন করতেন। হৃদয়বিয়ার সন্ধির প্রাক্কালে কুরাইশদের শত উসকানীর মুখেও তিনি ধৈর্য ধারণ করেন এবং হৃদয়বিয়ার সন্ধির অধিকাংশ শর্ত মুসলমানদের স্বার্থের প্রতিকূলে যাওয়ার পরেও তিনি এই সন্ধিপত্র সম্পাদনে একমত হন। আর প্রতিপক্ষ সন্ধির শর্তাবলী ভঙ্গ না করা পর্যন্ত তিনি তা মেনে চলেন।

কোন কারণে সন্ধিচুক্তি বাতিল করার প্রয়োজন দেখা দিলে রাসূল সা. তা প্রকাশ্যে ঘোষণা দিতেন। প্রকাশ্যে ঘোষণা প্রদান ব্যতীত তিনি কখনো প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করতেন না।^{১৪} শুধু তাই নয়, যাদের সাথে নিরাপত্তা চুক্তি বিদ্যমান তারা চুক্তি ভঙ্গ করলে রাসূল সা. চুক্তি ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন।^{১৫}

আট. দূতদের প্রতি যথোপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করতেন:

হৃদয়বিয়ার সন্ধির পরবর্তীকালে সমাজে শান্তি, স্থিতিশীলতা ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হলে এবং প্রতিপক্ষের দিক থেকে কোন ধরনের আক্রমণের আশঙ্কা না থাকলে রাসূল সা. রোম, পারস্য, মিসর, ইথিওপিয়া প্রভৃতি অঞ্চলের রাজা-বাদশাহ, নৃপতি ও গোত্র প্রধানদের নিকট দূত মারফত পত্র প্রেরণ করে তাদেরকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার আমন্ত্রণ জানান। পারস্যের সম্রাট খসরু পারভেজ রাসূল সা. কর্তৃক প্রেরিত দূতকে হত্যা করে।^{১৬} একই সময়ে বিভিন্ন অঞ্চল হতে দূতগণ রাসূল সা. এর নিকট আগমন করে। আর তিনি তাদের সবাইকে যথোপযুক্ত সম্মান করেন। এমন কি ভক্ত নবুওয়াতের দাবীদার মুসায়লামার পক্ষ হতে দূত হিসাবে সুমামাহ

^{১২} . সহীহ আল বুখারী, হাদীস নং ২৮৪৬, সহীহ মুসলীম, হাদীস নং ২৪১৫।

^{১৩} . সহীহ আল বুখারী, হাদীস নং ৬২৫৯

^{১৪} . সহীহ আল বুখারী: হাদীস নং-২৭৩১।

^{১৫} . সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং-৩০০১, সহীহ আল বুখারী হাদীস নং-৪০২৮।

^{১৬} . সহীহ আল বুখারী হাদীস নং- ৬৪, ৪৪২৪।

ইবনু উছাল সহ দুজন আগমন করলে রাসূল সা. তার সাথে সদ্‌ব্যবহার করে বলেন:^{১৭}

لو كنت قاتلا رسولا لقتلتكما " قال عبد الله : " قال : فمضت السنة أن
الرسول لا تقتل

অর্থাৎ: যদি আমি কোন দূতকে হত্যা করতাম তাহলে তোমাদের দুজনকে হত্যা করতাম। তখন থেকে এই রীতি প্রচলিত হলো যে, দূতকে হত্যা করা যাবে না।

নয়. ক্ষতির আশঙ্কা না থাকলে যুদ্ধক্ষেত্রে কাউকে হত্যা করতেন না:

সাধারণত যুদ্ধক্ষেত্রে প্রতিপক্ষের পক্ষ হতে কোন ধরনের ক্ষতির আশঙ্কা না থাকলে রাসূল সা. কাউকে হত্যা করার পক্ষপাতী ছিলেন না। ইহুদী নেতা কাব ইবনু আশরাফ ও আবু রাফে মদীনার ইসলামী রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের বিপক্ষে অবস্থান গ্রহণ করলে রাসূল সা. রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে তাদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করেন।^{১৮} পক্ষান্তরে বনু গাতফানের সাথে সংঘটিত যুদ্ধে রাসূল সা. গাছের সাথে তরবারী ঝুলিয়ে ঘুমিয়ে পড়লে শত্রু পক্ষের একজন উক্ত তরবারী হস্তগত করে রাসূল সা. কে শহীদ করার জন্য উদ্যত হয়। কিন্তু রাসূল সা. এর গুরুগম্ভীর কণ্ঠে তার হাত থেকে তরবারী পড়ে যায় এবং রাসূল সা. আশংকামুক্ত হন। ফলে তিনি হাতের নাগালে পেয়েও তাকে হত্যা করা হতে বিরত থাকেন।^{১৯}

দশ. বন্দীদের সাথে উত্তম আচরণ করতেন:

যুদ্ধক্ষেত্রে যেসব অমুসলিম যোদ্ধা বন্দী হত রাসূল সা. তাদের সাথে সর্বোত্তম আচরণ করতেন। তাদের জন্য উন্নতমানের খাবার এবং নতুন পোশাক-পরিচ্ছদের ব্যবস্থা করতেন। বনু খুযাইমাহ গোত্রের কিছু যুদ্ধবন্দীকে খালিদ ইবনু ওয়ালিদ রা. হত্যা করতে উদ্যত হলে সাহাবীগণ এতে সম্মত হননি। অভিযান শেষে মদীনা আগমন করে তাঁরা রাসূল সা. এর নিকট পুরো ঘটনা বর্ণনা করেন। সবকিছু শুনে রাসূল সা. খালিদ ইবনু

^{১৭} . মুসনাদে ইমাম আহমদ, হাদীস নং-৩৭৬১, মুহাম্মদ ইবনু আলী আস শাওকানী, নায়লুল আওতার, খন্ড ৮, পৃ. ৩৬।

^{১৮} . সহীহ আল বুখারী, হাদীস নং-৩৮১১, ৩৮১৩।

^{১৯} . সহীহ আল বুখারী, হাদীস নং-৩৯০৫, ৩৯০৬।

ওয়ালিদ রা. এর প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে বলেন: ২০ **اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد**

হে আল্লাহ! আমি খালিদের কৃতকর্মের প্রতি সম্পূর্ণতার ব্যাপারে নিজেকে মুক্ত থাকার ঘোষণা দিচ্ছি।

বনু হানীফা গোত্রের বন্দী সুমামাহ ইবনু উছালকে মসজিদের খুঁটির সাথে বেঁধে রাখলেও তাকে প্রয়োজনীয় উন্নত মানের খাবার এবং উত্তম পরিধেয় সরবরাহ করেন। এতে তিনি সন্তুষ্ট হয়ে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন।^{২১}

রাসূল সা. তনয়া যয়নব রা. এর স্বামী আবুল আস ইবনুর রাবী বদর যুদ্ধে বন্দী হলে সাহাবীগণ তাঁর সাথে উত্তম আচরণ করেন। এমন কি তাঁর মুক্তিপণও মওকুফ করে দেন।^{২২}

এগার. মুসলিম যোদ্ধাদের প্রতি সাধারণ নির্দেশনা প্রদান করতেন:

রাসূল সা. স্বয়ং যেইসব যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারতেন না সেখানে অন্য কোন যোগ্য সাহাবীর নেতৃত্বে সারিয়্যাহ প্রেরণ করতেন। এ সময় তিনি সারিয়্যাহ প্রধানকে উদ্দেশ্য করে বলতেন, আল্লাহকে ভয় করবে, সঙ্গী সাথীদের সাথে উত্তম আচরণ করবে, আল্লাহর নাম নিয়ে যুদ্ধে অবতীর্ণ হবে, অমুসলিমদের সাথে যুদ্ধ করতে গিয়ে কোন প্রকার বাড়াবাড়ি করবে না, ধোঁকা, প্রতারণা ও বিশ্বাসঘাতকতা করবে না, কোন বন্দী কিংবা আহত ব্যক্তির অঙ্গহানি করবে না, কোন শিশুকে হত্যা করবে না, ইসলাম গ্রহণে সম্মত না হলে তাদেরকে জিযিয়া কর প্রদানে বাধ্য করবে।^{২৩}

রাসূল সা. রোমানদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনার জন্য হযরত উসামাহ ইবনু যায়েদ রা. এর নেতৃত্বে সারিয়্যাহ গঠন করেন। অতঃপর তিনি উসামাহ ইবনু যায়েদকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন, আল্লাহর নামে পথ চলা শুরু করবে, মহান আল্লাহর নাম নিয়ে যুদ্ধের সূচনা করবে। যুদ্ধ করবে কেবল অবিশ্বাসীদের সাথে, বিশ্বাসঘাতকতা ও খেয়ানত করবে না, গণীমতের সম্পদ আত্মসাৎ করবে না, বয়স্ক লোকজন, কোন নারী এবং শিশুকে হত্যা করবে না, কারো অঙ্গহানি ঘটাবে না, খেজুর বাগান ধ্বংস করবেনা, ফলদার বৃক্ষ নিধন করবে না, গবাদি পশু হত্যা করবে না, তোমরা

২০. সহীহ আল বুখারী, হাদীস নং-৭১৮৯।

২১. সহীহ আল বুখারী: হাদীস নং-৪১১৪।

২২. আল যাহাবী, সিয়রু আলাম আল নুবালা, ১ম খন্ড, পৃ. ৩৩৩।

২৩. সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-১৭৩১।

কিছু লোককে ধর্মীয় উপসনালয়ে অবস্থান করতে দেখবে, তাদের সেখানে অবস্থান করতে বাধা দিবে না।^{২৪} রাসূল সা. চুক্তিবদ্ধ জাতিগোষ্ঠীর সাথে চুক্তি রক্ষা করার নির্দেশ দেন এবং তাদেরকে হত্যা করতে নিষেধ করেন।

২৫

উপসংহার:

উপসংহারে আমরা বলতে পারি, যুদ্ধ ইসলামের মূল বিষয় নয়। ইসলামের মূল লক্ষ্য হলো সমাজে শান্তি, শৃঙ্খলা, স্থিতিশীলতা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং সমাজে বসবাসরত ধর্ম-বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে সকলের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব ও সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা। যদি প্রতিপক্ষ দ্বারা মুসলিমগণ আক্রান্ত হন, তাদের দ্বারা জুলুম-নির্যাতনের শিকার হন এবং যুদ্ধ করা ব্যতীত এর বিকল্প কোন সমাধান না থাকে, তবে এমতাবস্থায় আত্মরক্ষা এবং দ্বীনের বুনিয়াদী বিষয় রক্ষা ও হেফাজত করার জন্য ইসলাম যুদ্ধের অনুমতি দেয়। তবে এ ক্ষেত্রে যুদ্ধের নীতিমালা, মানবতা, সংযম ও শৃঙ্খলা ইত্যাদি মৌলিক বিষয় অনুসরণ করতে হবে, যার সর্বোৎকৃষ্ট মডেল উপস্থাপন করেছেন রাসূল সা. তাঁর সময়ে সংঘটিত যুদ্ধ সমূহে।

লেখক : প্রফেসর, আরবী বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

^{২৪} . আল ইকদুর ফরীদ, ১ম খন্ড, পৃ. ৪০, আহমদ যখী সাফওয়াত, জামহারা তু খুতাবিল আরব, ১ম খন্ড, পৃ. ১৮৭।

^{২৫} . সহীহ আল বুখারী: হাদীস নং- ৩০১৬।

মুরতাদের পরিচয়, পরিণাম ও কারণসমূহ।

ড. মাওলানা মুহাম্মদ নেজাম উদ্দিন

ভূমিকা: আল-কুরআন থেকে **وَمَنْ يَزِدْكَ مِنْكَ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ** **فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ** **فِيهَا خَالِدُونَ** আর যে তোমাদের মধ্য থেকে তাঁর দীন থেকে ফিরে যাবে, অতঃপর কাফির অবস্থায় মৃত্যু বরণ করবে, বস্তুত এদের আমলসমূহ দুনিয়া ও আখিরাতে বিনষ্ট হয়ে যাবে এবং তারাই আগুনের অধিবাসী। তারা সেখানে স্থায়ী হবে। (সূরা আল-বাকারা। আয়াতঃ ২১৭) ২. হাদিসুন নববী থেকে আবু সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ) বলেন: “রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের আসরের নামাজ পড়ালেন দিনের আলোতে। এরপর তিনি আমাদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখলেন। আমরা যা মনে রেখেছি তার মধ্যে তিনি বললেন: ‘জেনে রাখো, আদম সন্তান বিভিন্ন স্তরে (শ্রেণিতে) সৃষ্টি হয়েছে— আবার কেউ আছে যে মুমিন হয়ে জন্ম নেয়, মুমিন অবস্থায় জীবন যাপন করে কিন্তু কাফের অবস্থায় মৃত্যু বরণ করে। (সুনান আত তিরমিজী) **بِالْأَعْمَالِ بِالْخَوَاتِيمِ** সাহল ইবনু সা’দ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ... বললেনঃ নিশ্চয়ই মানুষের আমলের ভাল-মন্দ নির্ভর করে তার শেষ অবস্থার উপর। (সহীহ বুখারী)

কিয়ামাতের আলামত **عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: إِنَّ مِنْ أَسْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ، وَيَكْثُرَ الْجَهْلُ، وَيَكْثُرَ الزِّنَا، وَيَكْثُرَ شُرْبُ الْخَمْرِ، وَيَقِلَّ الرَّجَالُ، وَيَكْثُرَ النِّسَاءُ، حَتَّى يَكُونَ لِلْخَمْسِينَ امْرَأَةً الْفَيْمُ الْوَاحِدُ** (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি: “নিশ্চয়ই কিয়ামতের আলামতসমূহের মধ্যে একটি হলো— জ্ঞান উঠিয়ে নেওয়া হবে, অজ্ঞতা বেড়ে যাবে, ব্যভিচার (জিনা) বৃদ্ধি পাবে, মদ পান বৃদ্ধি পাবে, পুরুষ কমে যাবে, নারীর সংখ্যা বেড়ে যাবে, এমনকি এক ব্যক্তি পঞ্চাশজন নারীর অভিভাবক হবে।” – (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)

শয়তানের চ্যালেঞ্জ: **ثُمَّ لَا تَنْبَهُهُمْ مَنْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ** “তারপর আমি তাদের কাছে আসব তাদের সামনে থেকে, তাদের পিছন থেকে, তাদের ডান দিক থেকে

এবং তাদের বাম দিক থেকে। আর তুমি তাদের অধিকাংশকে কৃতজ্ঞ পাওয়া যাবে না।” (সূরা আল-আরাফ: ১৭)

জীবনাদর্শ অনুসরণ হযরত আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা.)-এর একটি বাণী: “مَنْ كَانَ مُسْتِنًا فَلْيَسْتَنَّ بِمَنْ قَدْ مَاتَ فَإِنَّ الْحَيَّ لَا تُؤْمَنُ عَلَيْهِ الْفِتْنَةُ” যে কেউ কারো অনুসরণ করতে চায়, সে যেন মৃতদের অনুসরণ করে। কারণ জীবিত মানুষ ফিতনা (পরীক্ষা ও বিপথগামিতা) থেকে নিরাপদ নয়।

মুরতাদের পরিচয়: “মুরতাদ” (المرتد) শব্দটি ارتداد থেকে আগত। অর্থ: ফিরিয়ে দেওয়া, প্রত্যাবর্তন করা, ফিরে যাওয়া। ইসলামী পরিভাষায়, যে ব্যক্তি মুসলমান হওয়ার পরে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ইসলাম ছেড়ে দেওয়া, ইসলাম থেকে কুফুরির দিকে প্রত্যাবর্তন করা, আল্লাহর দ্বীন ও নবী পাকের আদর্শ থেকে অন্য আদর্শের দিকে চলে যাওয়া তার নাম (المرتد) মুরতাদ বা ধর্মত্যাগী।

মুরতাদের শাস্তি ও পরিণাম ১। যে মুসলমান দ্বীন পরিবর্তন করবে তার দুনিয়াতে থাকার অধিকান নেই। ২। তার মৃত্যু কাফেরের মৃত্যু। (সূরাঃ আল-বাকারাহ। আয়াতঃ ২১৭) ৩। তার আমলসমূহ দুনিয়া ও আখিরাতে বিনষ্ট হয়ে যাবে ৪। তার জন্য প্রার্থী ব জীবনে লাঞ্ছনা। ৫। তার সকল বাজেয়াপ্ত করা হবে। (মুরতাদ হওয়ার পর অর্জিত সম্পদ) ৬। এবং সে চিরস্থায়ী আগুনের (জাহান্নামের) অধিবাসী হবে।

মুরতাদের প্রকারভেদ মুরতাদ দুই ধরনের। যেমন- ১। স্পষ্ট মুরতাদ বা ধর্মত্যাগী ২। অস্পষ্ট মুরতাদ বা ধর্মত্যাগী

মুরতাদের সাথে সম্পর্ক ১। মুরতাদের সাথে বিয়ে বসা হারাম ২। তাকে সালাম দেওয়া হারাম ৩। তার জানাজা পড়া হারাম ৪। তাকে মুসলমানের কবরস্থানে করব দেওয়া হারাম।

মুরতাদকে ফিরে আসার সুযোগ ১। মুরতাদকে তাওবা করার জন্য ৩ দিন সময় দিতে হবে। ২। আবার ইসলাম গ্রহণ করার জন্য বলতে হবে। ৩। তাওবা করে ফিরে আসলে তাকে ক্ষমা করা হবে। অন্যথায় তাকে ইসলামী রাষ্ট্র মৃত্যু/তুদ/ও দিবেন।

মুরতাদ হওয়ার কারণ ১। আল্লাহকে অস্বীকার করা। (জাত ও সেফাতসহ) ২। শিরকে আকবর করলে ৩। রাসূল সা. এর শানে অবজ্ঞা করা করলে ৪। রাসূল সা. এর আদর্শ বাদ দিয়ে অন্য আদর্শ গ্রহণ করলে ৫। হারামকে হালাল মনে করলে মুরতাদ থেকে রক্ষা পেতে হলে করণীয় ১। ওহির ইলম

(জ্ঞান) অর্জন। (কুরআন, হাদিস, ফিকহ, আকিদাহ) ২। কথায় কাজে মিল রাখা ৩। সংঘবদ্ধ জীবন জীবন যাপন ৪। নবীর আদর্শ প্রতিষ্ঠার কাজে আমৃত্যু শরিক থাকা। (জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى شَيْءِ كَقَوْلِهِ هُوَ الْمُؤْمِنُونَ، তোমরা ঈমান আন আল্লাহর প্রতি, তাঁর রাসূলের প্রতি এবং সে কিতাবের প্রতি যা তিনি তাঁর রাসূলের উপর নাযিল করেছেন এবং সে কিতাবের প্রতি যা তিনি পূর্বে নাযিল করেছেন। (সূরাঃ আন-নিসা। আয়াতঃ ১৩৬) يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ (سُورَةُ الْأَنْعَامِ : ১) هُوَ الْمُؤْمِنُونَ، তোমরা তা কেন বল, যা তোমরা কর না? (সূরাঃ আস-সফ : ২) فَمَنْ رُحِزَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ وَ مَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ দূরে রাখা হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে সে-ই সফলতা পাবে। আর দুনিয়ার জীবন শুধু ধোঁকার সামগ্রী। (সূরাঃ আলে-ইমরান : ১৮৫)

লেখক : অধ্যাপক, আরবি বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

১৯ দিনব্যাপী ঐতিহাসিক ৫৫তম আন্তর্জাতিক সীরাতুননবি ﷺ মাহফিল ২০২২ইং আলোচিত।

আল-কুরআন ও আধুনিক বিজ্ঞান

ড. মাওলানা গিয়াস উদ্দিন তালুকদার

আল-কুরআন মহান আল্লাহ তাআলার সর্বশেষ আসমানি কিতাব, যা মানবজাতির জন্য হিদায়াত, নৈতিকতা এবং পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থার উৎস। কুরআনের মূল উদ্দেশ্য মানুষের ঈমান, আমল ও চরিত্রকে শুদ্ধ করা। তবে এর পাশাপাশি কুরআনে মহাবিশ্ব, আকাশমণ্ডল, পৃথিবী, সূর্য, চন্দ্র, বৃষ্টি, উদ্ভিদ, প্রাণিজগৎ এবং মানবসৃষ্টির মতো বহু প্রাকৃতিক বিষয়ের প্রতি চিন্তা-গবেষণার আহ্বান জানানো হয়েছে। এ কারণে কুরআনকে শুধু ধর্মীয় গ্রন্থ নয়, বরং জ্ঞানচর্চার এক অনন্য উৎস হিসেবেও বিবেচনা করা হয়।

আধুনিক বিজ্ঞান পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষা ও গবেষণার মাধ্যমে প্রকৃতির নিয়ম আবিষ্কার করে। অন্যদিকে কুরআন মানুষকে সৃষ্টিজগতের নিদর্শন পর্যবেক্ষণ করে স্রষ্টার মহিমা উপলব্ধি করতে আহ্বান জানায়। তাই কুরআন ও বিজ্ঞানের সম্পর্ক প্রতিযোগিতার নয়; বরং পরিপূরক। কুরআনের উদ্দেশ্য বৈজ্ঞানিক সূত্র শেখানো নয়, বরং মানুষকে সত্য অনুসন্ধান, চিন্তাশীলতা ও আল্লাহর নিদর্শন সম্পর্কে গভীরভাবে ভাবতে উদ্বুদ্ধ করা।

জ্ঞানচর্চার গুরুত্ব, মহাবিশ্বের সৃষ্টি এবং বিজ্ঞান সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় ভাগে কুরআনে উল্লেখিত কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক নিদর্শন, আধুনিক বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণের সঙ্গে সেগুলোর সম্পর্ক, মুসলিম বিজ্ঞানীদের অবদান এবং বর্তমান যুগে কুরআন ও বিজ্ঞানচর্চার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনা করা হলো।

এটি মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, “কুরআনের মূল উদ্দেশ্য মানুষকে হিদায়াত প্রদান”। কুরআন বিজ্ঞানপাঠ্য গ্রন্থ নয়; তবে এতে এমন বহু নিদর্শনের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে, যা মানুষকে গবেষণা, পর্যবেক্ষণ ও জ্ঞানচর্চায় উদ্বুদ্ধ করে।

আল-কুরআনের পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য

আল-কুরআন আল্লাহর বাণী, যা হযরত মুহাম্মাদ ﷺ-এর ওপর জিবরীল (আ.)-এর মাধ্যমে নাযিল হয়েছে। এটি কিয়ামত পর্যন্ত সমগ্র মানবজাতির জন্য সর্বশেষ ও পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান। আল্লাহ তাআলা বলেন **ذَٰلِكَ الْكِتَابُ** এ সেই কিতাব, যাতে কোনো সন্দেহ নেই; এটি মুত্তাকীদের জন্য হিদায়াত। (সূরা আল-বাকারা: ২) আরও বলেন **إِنَّ**

هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّذِي هِيَ أَفْوَمُ
দেয়, যা সর্বাধিক সরল ও সঠিক। (সূরা আল-ইসরা: ৯)

ইসলামে জ্ঞান ও বিজ্ঞানচর্চার গুরুত্ব

ইসলামের প্রথম নাযিলকৃত শব্দই ছিল اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ পড়ুন আপনার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। (সূরা আল-আলাক: ১) এ আয়াত জ্ঞানার্জনের গুরুত্বকে সর্বোচ্চ মর্যাদা দিয়েছে। ইসলাম অন্ধ অনুসরণের পরিবর্তে জ্ঞান, যুক্তি ও প্রমাণের ভিত্তিতে সত্য গ্রহণের শিক্ষা দেয়। আল্লাহ তাআলা বলেন قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ বলাবলুন, যারা জানে এবং যারা জানে না—তারা কি সমান হতে পারে? (সূরা আয-যুমার: ৯)

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন جَنَّاتُ الْجَنَّةِ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের ওপর ফরজ। (সুনান ইবনু মাজাহ) এখানে ‘ইলম’ বলতে সর্বপ্রথম দ্বীনি জ্ঞান বোঝানো হলেও, মানবকল্যাণে সহায়ক উপকারী জ্ঞানও ইসলামে উৎসাহিত।

কুরআনের দৃষ্টিতে চিন্তা, গবেষণা ও পর্যবেক্ষণ

কুরআনের বহু আয়াতে মানুষকে আকাশ, পৃথিবী, পাহাড়, নদী, উদ্ভিদ, প্রাণী ও নিজের সৃষ্টির দিকে গভীরভাবে লক্ষ্য করার আহ্বান জানানো হয়েছে। আল্লাহ বলেন إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالاخْتِلَافِ اللَّيْلِ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَايَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ নিশ্চয়ই আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে এবং রাত-দিনের পরিবর্তনে জ্ঞানীদের জন্য নিদর্শন রয়েছে। (সূরা আলে ইমরান: ১৯০) এই আয়াত মানুষকে প্রকৃতির রহস্য নিয়ে চিন্তা করতে এবং সৃষ্টিকর্তার মহিমা উপলব্ধি করতে উদ্বুদ্ধ করে।

মহাবিশ্বের সৃষ্টি সম্পর্কে কুরআনের ইঙ্গিত

আল্লাহ তাআলা বলেন أَوَلَمْ يَرِ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا কাফিররা কি দেখে না যে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী একত্র ছিল; তারপর আমি উভয়কে পৃথক করে দিয়েছি। (সূরা আল-আম্বিয়া: ৩০) মুফাসসিরগণ এ আয়াতের বিভিন্ন ব্যাখ্যা করেছেন। কেউ এটিকে আকাশ ও পৃথিবীর পৃথক সৃষ্টির বর্ণনা বলেছেন, আবার কেউ এতে সৃষ্টির সূচনাবিষয়ক ইঙ্গিত দেখেছেন। সমকালীন কিছু লেখক আধুনিক মহাবিশ্বতত্ত্বের সঙ্গে তুলনা টানলেও, এ ধরনের তুলনা সতর্কতার সঙ্গে করা

উচিত; কারণ কুরআনের মূল উদ্দেশ্য বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা নয়, বরং আল্লাহর সৃষ্টিশক্তির নিদর্শন তুলে ধরা।

সূর্য ও চন্দ্রের নির্ধারিত কক্ষপথ

আল্লাহ তাআলা বলেন **وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ** প্রত্যেকেই নিজ নিজ কক্ষপথে বিচরণ করছে।” (সূরা ইয়াসীন: ৪০) এই আয়াত মহাবিশ্বে আল্লাহর নির্ধারিত শৃঙ্খলা ও নিয়মের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানও দেখায় যে মহাজাগতিক বস্তুসমূহ নির্দিষ্ট নিয়মে গতি করে, যদিও কুরআনের উদ্দেশ্য এখানে বৈজ্ঞানিক পাঠ্যবইয়ের মতো কক্ষপথের বিশদ ব্যাখ্যা দেওয়া নয়।

দিন ও রাতের পরিবর্তন

আল্লাহ বলেন **يُولِجُ اللَّيْلُ فِي النَّهَارِ وَيُؤَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ** তিনি রাতকে দিনে প্রবেশ করান এবং দিনকে রাতে প্রবেশ করান। (সূরা আল-হাদীদ: ৬) দিন-রাতের ধারাবাহিক পরিবর্তন পৃথিবীর সুশৃঙ্খল ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন, যা মানুষের জীবন, কৃষি, জলবায়ু ও পরিবেশের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত।

সৃষ্টিজগত আল্লাহর নিদর্শন

কুরআন মানুষকে প্রকৃতির প্রতিটি বিষয় থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে উৎসাহিত করেছে। আল্লাহ বলেন **سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ** অচিরেই আমি তাদেরকে আমার নিদর্শনসমূহ দিগন্তে এবং তাদের নিজেদের মধ্যে দেখাব। (সূরা ফুসসিলাত: ৫৩) এ আয়াত মানুষকে বহির্বিশ্ব এবং নিজের শরীর-উভয় ক্ষেত্রেই আল্লাহর নিদর্শন অনুসন্ধানের আহ্বান জানায়।

কুরআন ও বিজ্ঞানের সম্পর্ক: সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি

বর্তমানে অনেকেই কুরআনের প্রতিটি আয়াতকে আধুনিক বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের সঙ্গে সরাসরি মিলিয়ে দেখার চেষ্টা করেন। তবে এ ক্ষেত্রে ভারসাম্য রক্ষা জরুরি।

কুরআনের মূল উদ্দেশ্য

মানুষকে আল্লাহর পরিচয় করিয়ে দেওয়া।

- নতিক জীবন গড়ে তোলা।
- ঈমান ও তাকওয়া সৃষ্টি করা।
- সৎকর্মের পথে পরিচালিত করা।

বিজ্ঞান প্রকৃতির কার্যপ্রণালি ব্যাখ্যা করে, আর কুরআন মানুষকে সেই প্রকৃতির স্রষ্টার দিকে পরিচালিত করে। তাই কুরআনের বৈজ্ঞানিক ইঙ্গিতকে এমনভাবে ব্যাখ্যা করা উচিত নয়, যাতে পরিবর্তনশীল বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের ওপর কুরআনের অর্থ নির্ভরশীল হয়ে পড়ে।

মুসলিম বিজ্ঞানীদের অবদানের ভিত্তি

কুরআনের জ্ঞানচর্চার আহ্বানে অনুপ্রাণিত হয়ে মুসলিম সভ্যতায় বহু বিজ্ঞানীর আবির্ভাব ঘটে। যেমন

ইবনে আল-হাইসাম, আলোকবিজ্ঞানের অগ্রদূত।

আল-বিরুনী, জ্যোতির্বিজ্ঞান ও ভূগোলবিদ।

ইবনু সিনা, চিকিৎসাবিজ্ঞানের বিশ্বখ্যাত পণ্ডিত।

আল-খাওয়ারিজমি, বীজগণিতের অন্যতম পথিকৃৎ।

তারা কুরআনের চিন্তা, পর্যবেক্ষণ ও গবেষণার চেতনাকে ধারণ করে মানবসভ্যতায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। মানব জ্ঞানের বিকাশ সম্পর্কে কুরআনের ইঙ্গিত

আল্লাহ তাআলা বলেন **وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ۝ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ۝ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً**

আমি মানুষকে মাটির নির্যাস থেকে সৃষ্টি করেছি। অতঃপর তাকে নিরাপদ স্থানে বীর্যরূপে স্থাপন করেছি। তারপর বীর্যকে জমাট রক্তসদৃশ বস্তুতে, তারপর তা থেকে মাংসপিণ্ডে রূপান্তর করেছি। (সূরা আল-মুমিনুন: ১২-১৪) এই আয়াতগুলো মানব জ্ঞানের ধাপে ধাপে বিকাশের বর্ণনা দেয়। আধুনিক জ্ঞানতত্ত্বেও জ্ঞানের বিভিন্ন পর্যায়ে বিকাশের কথা বলা হয়েছে। তবে কুরআনের ভাষা মূলত হিদায়াতমূলক ও মানবসৃষ্টির বিস্ময় স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে।

পানি থেকে জীবনের সৃষ্টি

আল্লাহ তাআলা বলেন **وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ** আমি পানি থেকে প্রত্যেক জীবন্ত বস্তুকে সৃষ্টি করেছি। সূরা আল-আম্বিয়া: ৩০) আধুনিক জীববিজ্ঞানে পানি জীবনের জন্য অপরিহার্য বলে স্বীকৃত। জীবদেহের বড় অংশই পানি দ্বারা গঠিত এবং জীবনের মৌলিক প্রক্রিয়াগুলো পানির ওপর নির্ভরশীল।

পাহাড়ের ভূমিকা

আল্লাহ বলেন **وَالْجِبَالُ أَوْتَادٌ** আর আমি পাহাড়কে করেছি খুঁটির মতো। (সূরা আন-নাবা: ৭) অন্যত্র বলা হয়েছে **وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ** তিনি পৃথিবীতে দৃঢ় পর্বত স্থাপন করেছেন, যাতে পৃথিবী তোমাদের নিয়ে অতিরিক্ত দুলে না ওঠে। (সূরা আন-নাহল: ১৫) তাফসিরবিদরা এ আয়াতগুলোর বিভিন্ন ব্যাখ্যা করেছেন। আধুনিক ভূতত্ত্বে পর্বতের ভূগর্ভস্থ শিকড় এবং ভূত্বকের গঠনে তাদের ভূমিকা নিয়ে গবেষণা রয়েছে। তবে নির্দিষ্ট বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকে কুরআনের একমাত্র ব্যাখ্যা হিসেবে উপস্থাপন করা থেকে বিরত থাকা উচিত।

সমুদ্র সম্পর্কে কুরআনের বর্ণনা

আল্লাহ তাআলা বলেন **مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ ۚ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ** তিনি দুই সমুদ্রকে প্রবাহিত করেছেন, তারা মিলিত হয়; কিন্তু তাদের মধ্যে রয়েছে এক অন্তরাল, যা তারা অতিক্রম করে না। (সূরা আর-রহমান: ১৯-২০) আধুনিক সমুদ্রবিজ্ঞানে বিভিন্ন জলরাশির লবণাক্ততা, তাপমাত্রা ও ঘনত্বের পার্থক্যের কারণে নির্দিষ্ট সীমারেখা বা মিশ্রণ অঞ্চল নিয়ে গবেষণা রয়েছে। কুরআনের এই আয়াত মানুষকে আল্লাহর সৃষ্টির সূক্ষ্ম নিয়ম সম্পর্কে চিন্তা করতে উদ্বুদ্ধ করে।

বৃষ্টিপাত ও পানি চক্র

আল্লাহ তাআলা বলেন **يَقْدِرُ مَاءَ السَّمَاءِ مِنْ أَنْزَلْنَا** আমি আকাশ থেকে পরিমিত পরিমাণে পানি বর্ষণ করেছি।” (সূরা আল-মুমিনুন: ১৮) আরও বলেন **اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَّاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا** আল্লাহই বায়ু প্রেরণ করেন, অতঃপর তা মেঘ সৃষ্টি করে। (সূরা আর-রুম: ৪৮) এই আয়াতগুলো বায়ু, মেঘ ও বৃষ্টির মধ্যকার সম্পর্কের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং মানুষের মনে আল্লাহর নিয়ন্ত্রণ ও পরিকল্পনার অনুভূতি জাগ্রত করে। মৌমাছি ও প্রাকৃতিক পরিবেশ আল্লাহ তাআলা বলেন **وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ... يَخْرُجُ مِنْ** তোমার প্রতিপালক মৌমাছিকে নির্দেশ দিলেন... তাদের উদর থেকে বিভিন্ন রঙের পানীয় (মধু) বের হয়, যাতে মানুষের জন্য আরোগ্য রয়েছে। (সূরা আন-নাহল: ৬৮-৬৯) মধুর পুষ্টিগুণ ও কিছু ঔষধি বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বহু বৈজ্ঞানিক গবেষণা হয়েছে। তবে চিকিৎসার ক্ষেত্রে সর্বদা বিশেষজ্ঞের পরামর্শ অনুসরণ করা উচিত।

উদ্ভিদজগত ও জীববৈচিত্র্য

আল্লাহ তাআলা বলেন وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ رَوْحٍ وَأَمَّا آكَاشٌ مِنْهُ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مِنْهُ شَيْءٌ مِنْ رَوْحٍ وَأَمَّا آكَاشٌ مِنْهُ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مِنْهُ شَيْءٌ مِنْ رَوْحٍ (সূরা লুকমান: ১০) কুরআন উদ্ভিদ, ফল, শস্য ও পরিবেশের প্রতি মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং এগুলোকে আল্লাহর অনুগ্রহের নিদর্শন হিসেবে উল্লেখ করে।

কুরআন ও বিজ্ঞানের সম্পর্ক: ভারসাম্যপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি

কুরআনের সঙ্গে বিজ্ঞান নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে কয়েকটি বিষয় মনে রাখা জরুরি

১. কুরআনের মূল উদ্দেশ্য মানুষের হিদায়াত ও নৈতিক উন্নয়ন।
২. বিজ্ঞান পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার মাধ্যমে প্রকৃতির কার্যপ্রণালি ব্যাখ্যা করে; কুরআন সেই প্রকৃতির স্রষ্টার পরিচয় করিয়ে দেয়।
৩. পরিবর্তনশীল বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের সঙ্গে কুরআনের আয়াতকে জোরপূর্বক মিলিয়ে দেখা উচিত নয়।
৪. কুরআনের বৈজ্ঞানিক ইঙ্গিত মানুষের চিন্তা, গবেষণা ও আল্লাহর নিদর্শন অনুধাবনের আহ্বান হিসেবে বিবেচনা করা অধিকতর সঙ্গত।

মুসলিম বিজ্ঞানীদের অবদান

কুরআনের জ্ঞানচর্চার আহ্বানে উদ্বুদ্ধ হয়ে মুসলিম সভ্যতায় বহু বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানীর জন্ম হয়েছে।

ইবনু আল-হাইসাম

আলোকবিজ্ঞানের অন্যতম অগ্রদূত। তাঁর গবেষণা আধুনিক অপটিক্সের ভিত্তি স্থাপনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

আল-বিরুনী জ্যোতির্বিজ্ঞান, ভূগোল, গণিত ও ভূতত্ত্বে অসাধারণ অবদান রেখেছেন।

ইবনে সিনা

চিকিৎসাবিজ্ঞানের ইতিহাসে অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষী। তাঁর আল-কানুন ফিত-তিব্ব শতাব্দীর পর শতাব্দী চিকিৎসাবিজ্ঞানের পাঠ্যগ্রন্থ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

আল-খাওয়ারিজমি

বীজগণিত (Algebra)-এর বিকাশে তাঁর অবদান বিশ্বস্বীকৃত।

বর্তমান যুগে কুরআন ও বিজ্ঞানচর্চার প্রয়োজনীয়তা

আজকের বিশ্ব প্রযুক্তি, চিকিৎসা, পরিবেশ, মহাকাশ ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার যুগ। মুসলিম সমাজ যদি কুরআনের জ্ঞানচর্চার চেতনাকে পুনর্জীবিত করতে পারে, তবে তারা মানবকল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হবে।

আমাদের উচিত

কুরআন গভীরভাবে অধ্যয়ন করা।

ধর্মীয় ও আধুনিক শিক্ষার সমন্বয় ঘটানো।

গবেষণামনস্ক জাতি গঠন করা।

পরিবেশ সংরক্ষণে সচেতন হওয়া।

বিজ্ঞানকে মানবকল্যাণে ব্যবহার করা।

জ্ঞানচর্চাকে ইবাদতের অংশ হিসেবে মূল্যায়ন করা।

১. কুরআন মানুষকে প্রকৃতি ও মহাবিশ্ব নিয়ে চিন্তা করতে আহ্বান জানায়।

২. মানবসৃষ্টি, পানি, পাহাড়, বৃষ্টি ও জীবজগত সম্পর্কে কুরআনের বহু আয়াত আল্লাহর নিদর্শনের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

৩. বিজ্ঞান ও কুরআন একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী নয়; বরং ভিন্ন উদ্দেশ্যে সত্য অনুসন্ধানে সহায়ক।

৪. মুসলিম বিজ্ঞানীদের সাফল্যের পেছনে কুরআনের জ্ঞানচর্চার চেতনা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল।

৫. আধুনিক যুগে কুরআনের আলোকে নৈতিকতা ও বিজ্ঞানচর্চার সমন্বয় মানবজাতির কল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে।

১. আল-কুরআন মানবজাতির জন্য হিদায়াতের কিতাব, যার মধ্যে জ্ঞানচর্চার শক্তিশালী আহ্বান রয়েছে।

২. ইসলাম পর্যবেক্ষণ, গবেষণা, চিন্তা ও প্রমাণভিত্তিক জ্ঞানকে উৎসাহিত করে।

৩. কুরআনের বহু আয়াত মানুষকে প্রকৃতি ও মহাবিশ্ব নিয়ে চিন্তা করতে উদ্বুদ্ধ করে।

৪. বিজ্ঞান ও কুরআন পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী নয়; বরং ভিন্ন উদ্দেশ্য নিয়ে সত্য অনুসন্ধানে সহায়ক।

৫. কুরআনের বৈজ্ঞানিক ইঙ্গিত ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে তাফসির, ভাষা ও প্রতিষ্ঠিত বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা প্রয়োজন।

আল-কুরআন এমন এক মহাগ্রন্থ, যা মানুষের ঈমান, নৈতিকতা ও জীবনব্যবস্থার দিশারী হওয়ার পাশাপাশি জ্ঞান, চিন্তা ও গবেষণার দুয়ার উন্মুক্ত করেছে। কুরআন মানুষকে আকাশ, পৃথিবী, সূর্য, চন্দ্র, প্রকৃতি ও

নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করতে আহ্বান জানায়। এই আহ্বানই মুসলিম সভ্যতায় জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার ভিত্তি স্থাপন করেছিল।

অতএব, আমাদের উচিত কুরআনকে হিদায়াতের গ্রন্থ হিসেবে অধ্যয়ন করা, একই সঙ্গে এর আহ্বানে সাড়া দিয়ে বিজ্ঞান, গবেষণা ও মানবকল্যাণমূলক জ্ঞানচর্চায় আত্মনিয়োগ করা। এতে আমরা আল্লাহর সৃষ্টির মহিমা আরও গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পারব এবং দুনিয়া ও আখিরাত-উভয় ক্ষেত্রেই কল্যাণ লাভের আশা করতে পারব।

আল-কুরআন এমন এক ঐশী গ্রন্থ, যা মানুষের আত্মিক উন্নতি, নৈতিক চরিত্র গঠন এবং আল্লাহর পরিচয় লাভের পথনির্দেশ করে। একই সঙ্গে এটি মানুষকে সৃষ্টিজগতের রহস্য অন্বেষণ, গবেষণা ও জ্ঞানচর্চার জন্য অনুপ্রাণিত করে। আধুনিক বিজ্ঞান প্রকৃতির নিয়ম ও কার্যপ্রণালি ব্যাখ্যা করে, আর কুরআন সেই নিয়মের স্রষ্টার প্রতি মানুষের দৃষ্টি নিবদ্ধ করে।

অতএব, একজন মুসলমানের কর্তব্য হলো কুরআনের নির্দেশনা অনুযায়ী ঈমান, জ্ঞান, গবেষণা, নৈতিকতা ও মানবকল্যাণকে একত্রে ধারণ করা। কুরআনের আলোকে বিজ্ঞানচর্চা মানুষকে শুধু প্রযুক্তিগত উন্নতির দিকেই নয়, বরং মহান আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা, দায়িত্ববোধ এবং সৃষ্টির প্রতি সম্মানবোধ গড়ে তুলতেও সহায়তা করে। এভাবেই কুরআন ও বিজ্ঞান একসঙ্গে মানবসভ্যতার কল্যাণ ও উন্নতির পথকে আলোকিত করতে পারে।

লেখক: প্রফেসর, আরবি বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম।

ঐতিহাসিক ১৯ দিন ব্যাপি ৫৩ তম আন্তর্জাতিক মাহফিলে সীরতুননবী (সাঃ) এর ১৯তম দিবসের আলোচনা।

ইসলামে তাসাওউফের গুরুত্ব মানবজীবনে এর প্রয়োজনীয়তা ড. মুহাম্মদ এনামুল হক মুজাদ্দেদী

ভূমিকা

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। মানব জাতির জন্যে আল্লাহ তা'আলা এ বিধান প্রবর্তন করেছেন। মানুষের সার্বিক জীবনে আল্লাহ প্রদত্ত বিধি-বিধান বাস্তবায়নের জন্য নবী-রাসূলদের ধারাবাহিকতায় সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল হযরত মুহাম্মদ (সা.) কে প্রেরণ করেছেন। তিনি তাঁর নুবুওয়াতের তেইশ বছরের জিন্দেগীতে মানব সমাজে এ বিধান যথাযথভাবে কায়েম করে সফলতার স্বাক্ষর রাখেন। মানব জীবনের দু'টি দিক রয়েছে-একটি বস্তুগত বা বাহ্যিক (External) দিক, অপরটি অভ্যন্তরীণ (Internal) বা আধ্যাত্মিক দিক।

বস্তুগত দিক বলতে মানুষের সাথে যে সব বস্তু ও বিষয়ের প্রকাশ্য সংশ্লিষ্টতা বিদ্যমান সে সব বিষয়াবলী অন্তর্ভুক্ত। আর যে সব বিষয়ের পরোক্ষ বা গোপন সম্পর্ক রয়েছে তা আভ্যন্তরীণ বিষয়ের অন্তর্গত। ইসলাম মানুষের এ উভয় দিকের পরিশুদ্ধি কামনা করে সমানভাবে। তাই মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, আন্তর্জাতিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় প্রভৃতি ক্ষেত্রে ইসলামের সুনির্দিষ্ট বিধান বিদ্যমান রয়েছে, যার যথাযথ প্রয়োগ ও অনুসরণ তার বাহ্যিক পরিশুদ্ধির একমাত্র মাপকাঠি। অনুরূপভাবে এ সব বিষয়ের গ্রহণযোগ্যতার জন্য ইখলাছ তথা একমাত্র আল্লাহর সম্বন্ধিত উদ্দেশ্য বর্তমান থাকা আভ্যন্তরীণ পরিশুদ্ধির মাপকাঠি। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

وَمَا أَمْرُو إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ

"তাদেরকে নিষ্ঠার সাথে কেবলমাত্র আল্লাহর ইবাদত করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে"।^{২৬} আল্লাহরই সান্নিধ্য অর্জনের পথকে তাসাউফ নামে অভিহিত করা হয়। যাবতীয় ইবাদাত মানুষের প্রকাশ্য বিষয়ের অন্তর্গত এ ইবাদাতের বিশুদ্ধতা নির্ভর করে নিয়তের বিশুদ্ধতার উপর। মহানবী (সা.) ইরশাদ করেছেন,

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَىٰ.

^{২৬} . আল কুরআন, সূরা আল বাইয়েনাহ, ৯৮: ৫।

"নিশ্চয়ই সকল আমল (কাজ) নিয়তের ওপর নির্ভরশীল। প্রত্যেক ব্যক্তি তাই পাবে যার যার নিয়ত সে করেছে"।^{২৭} নিয়ত বলা হয়-

النّية هو توجّه القلب إلى جهة الفعل ابتغاء وجه الله تعالى و امتثالاً للأمر

"আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কোন কাজের দিকে অন্তরের দৃঢ় ইচ্ছাকে বলা হয় নিয়ত"। নিয়ত মূলত কালবের সাথে সংশ্লিষ্ট যা একান্ত আভ্যন্তরীণ বিষয়। এ কালবের ব্যাপক উৎকর্ষ সাধনের নিমিত্তে বিশুদ্ধ ইবাদাতের রীতিনীতি অনুসরণ অপরিহার্য। কালবের উন্নয়নের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য হাসিল হয়। আল্লাহর প্রিয় বান্দা হিসেবে পরিগণিত হয়ে তাঁরই সান্নিধ্য অর্জনের পথকে তাসাউফ নামে অভিহিত করা হয়।

তাসাউফ-এর পরিচিতি

তাসাউফ: শাব্দিক পরিচিতি

তাসাউফ শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ বিষয়ে কয়েকটি অভিমত পরিলক্ষিত হয়। যথা-

(ক) তাসাউফ تصوف ধাতু মূল (ص - و - ف) অর্থ পশম, উল হতে বাব-ই تفعّل এর ক্রিয়ামূল (মাসদার), অর্থ পশমী পোশাক পরিধান করা। সুতরাং সূফী হয়ে সূফী দরবেশদের ন্যায় (মোটামোটো পশমী) পোশাক পরিধান এবং নিজেকে কচ্ছতাপূর্ণ সূফী (متصوفانة) জীবন যাপনের জন্য নিবেদিত (ওয়াকফ) করাকে ইসলামী পরিভাষায় তাসাউফ নামে অভিহিত করা হয়।^{২৮}

(খ) কারো মতে তাসাউফ শব্দটি আস্ সাফা (الصفاء) শব্দমূল থেকে নির্গত। এর অর্থ পরিচ্ছন্নতা। যেহেতু এ দলের লোকেরা সব সময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতেন তাই তাদেরকে সূফী নামে আখ্যায়িত করা হয়।^{২৯}

(গ) কারো মতে, (صفوة) সাফওয়াতুন থেকে নির্গত। অর্থ পরিপূর্ণ। সূফীগণ পরিপূর্ণতা গুণে গুণান্বিত হন।

^{২৭}. বুখারী, মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল, সহীহ-বুখারী, ১ম খন্ড, কায়রো, মাকতাবাতুস সাফা, পৃ. ৯।

^{২৮}. ইসলামী বিশ্বকোষ ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০০৩, খন্ড-১২৮/৩।

^{২৯}. আল-রেফায়ী, সাইয়েদ ইউসুফ হাশেম, আস সূফীয়া ওয়াত-তাসাউফ, কুয়েত, প্রকাশক উলে-খবিহীন, ১৯৯৯/২০।

(ঘ) কারো মতে, সুফফাতুল মসজিদিন নববী (صفة المسجد النبوي) থেকে নির্গত। কেননা সূফীগণ মনোযোগ ও একাগ্রতার বিষয়ে আহলে সুফফা'র সদৃশ্য। নবী করীম (সা.) এর যুগে 'আহলে সুফফা' প্রায় সত্তর জন সাহাবী। যারা মসজিদে নববীতে এক ছাদবিহীন প্রকোষ্ঠে অবস্থান করতেন। রাসূল (সা.) তাদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখতেন।^{৩০}

(ঙ) কারো মতে আসাফ (الصنف) শব্দ থেকে নির্গত। এর অর্থ কাতার বা সারি। সূফী ইবাদতের ক্ষেত্রে প্রথম সারির লোক হিসেবে বিবেচিত। তাই সেদিক থেকে তাসাউফ নামে অভিহিত করা হয়।^{৩১}

(চ) কেউ বলেন, সাফে আউয়াল (صف اول) বা প্রথম কাতার শব্দ থেকে নির্গত। যেহেতু তাদের ধারণা ছিল যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য অর্জনের উদ্দেশ্যে এ দলের অন্তর্ভুক্ত হবেন, তিনি ইনশাআল্লাহ জান্নাত অধিকারীদের মধ্যে প্রথম সারির হবেন।

(ছ) মাওলানা আব্দুর রহীম হাযারী উল্লেখ করেছেন, সূফী শব্দটি গ্রীক 'সুইউসুফিয়া' শব্দ থেকে উৎকলিত। এর অর্থ গ্রীক ভাষায় প্রভু জ্ঞান। সূফী প্রভুর জ্ঞান সাধনায় মশগুল থাকেন। কারণ তিনি আত্ম সাধনার মাধ্যমে স্রষ্টা ও সৃষ্টি কৌশলের রহস্যভেদ উদঘাটন করেন।^{৩২}

(জ) বিশিষ্ট পণ্ডিত ড. আর. এ. নিকলসন বলেন, সূফী শব্দের উৎপত্তি গ্রীক 'সোফিস্ট' (Sophist) শব্দ থেকে। এর অর্থ জ্ঞানী সূফীরা বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ উভয় জ্ঞানের জ্ঞানী হয়ে থাকেন।^{৩৩}

(ঝ) বাগদাদের খ্যাতনামা ঐতিহাসিক আব্বাসী ইবনে জাওযী (মৃ. ৫৯৭ হি.) বলেন, জাহেলী যুগে সূফা নামক এক ব্যক্তির দিকে সম্পর্কিত করে সূফী নামকরণ করা হয়েছে। তার আসল নাম গাউছ ইবনুল মুর কিন্তু সে সূফা নামে খ্যাত ছিল।^{৩৪}

^{৩০} . আল ইম্পাহানী আশ শাফেয়ী, আবু নুআঈম আহমদ ইবনে আবদিল্লাহ, হিলয়াতুল আওলিয়া, আল-মানসূরা, মাকতাবাতুল ঈমান, ২০০৭/৩১৫।

^{৩১} . হাই, সাইয়েদ আব্দুল, মুসলিম দর্শন, ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮২/১৪১।

^{৩২} . হাযারী, মাওলানা আব্দুর রহীম, সূফী তত্ত্বের আত্ম কথা, ঢাকা, নবাব প্রকাশনী, ১৯৮৮/১।

^{৩৩} . আদেল, মাওলানা আখতার ইমাম, অনুবাদ, মাওলানা আব্দুল জব্বার, আল ইহসান, চট্টগ্রাম: শাহ আব্দুল জব্বার ফাউন্ডেশন, ১৯৯৯/২।

^{৩৪} . নিকলসন, ড. আর. এ., দি মিস্টিকস অফ ইসলাম, বৈরুত: খায়াতস, ১৯৬৬।

(এ৩) ড. নিকলসন সূফী শব্দের উৎপত্তি বিষয়ে অন্যান্য মত তথা 'সাফা' (পবিত্রতা) 'সুফ' (পশম), 'সফ' (সারি) ও 'সূফিয়া' (জ্ঞান) সম্পর্কে দেয়া ধারণাকে অগ্রাহ্য করেননি। তিনি তিনটি শব্দের সমন্বয়ে সূফী শব্দের উদ্ভব হয়েছে বলে মত প্রকাশ করেন।^{৩৫}

(ট) আল্লামা ইবনে উজাইবা প্রথমোক্ত ব্যুৎপত্তি টিকেই গ্রহণ করেন। এর কারণ হিসেবে তিনি বলেন,

لأنه كان هذا الاشتقاق أليق لغة وأظهر نسبة لأن لباسهم الصوف تقلاً
من الدنيا وزهداً فيها واختاروا ذلك لباس الأنبياء عليهم الصلوة
والسلام.

"এটি আভিধানিক ও সম্পর্কের বিবেচনায় যথাযোগ্য। দুনিয়ার মায়া ত্যাগ করে আল্লাহর সান্নিধ্য লাভে তাদের এ পশমী লেবাসের যথার্থতা রয়েছে। আশিয়া আলাইহিস সালামের পোষাক ও বৈশিষ্ট্যের ছিল বিধায় তারা (সূফীগণ) এটিকে বেছে নিয়েছেন"।^{৩৬} আল্লামা আবু নসর আস-সরাজ বলেন,

الصوفية نسبوا إلي ظاهر اللبسة لأن لبسة الصوف دأب الأنبياء
وشعار الأولياء الأصفياء "বাহ্যিক পোশাকের দিক থেকে সূফীদেরকে
সূফী বলা হয়। কারণ পশমের পোষাক পরিধান করা নবীদের স্বভাব এবং
অলী-সূফীদের প্রতীক"।^{৩৭}

তাসাউফ: পারিভাষিক পরিচিতি

আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনের নিমিত্তে মানবতার মহান শিক্ষক বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রদর্শিত পথের অনুসরণ, আল্লাহর অপছন্দনীয় বিষয়বলী পরিহার ও পছন্দনীয় বিষয়বলী গ্রহণ করে এর উপর সুদৃঢ় পদে প্রতিষ্ঠিত থাকার নাম তাসাউফ। একমাত্র আল্লাহর নৈকট্য হাসিলই তাসাউফের মূল লক্ষ্য। আল্লাহর মা'রিফাত তথা আল্লাহর পরিচয় লাভই তাসাউফের চূড়ান্ত মনজিল। তাসাউফের পরিচয় দিতে গিয়ে ইসলামী বিশেষজ্ঞগণ তাদের মতামত পেশ করেছেন বিভিন্নভাবে। শায়খুল ইসলাম যাকারিয়া আনসারী বলেন,

৩৫. নিকলসন, ড. আর. এ. স্টাডিজ ইসলামিক মিস্টিকিজম: কেমব্রিজ ১৯৬৭।

৩৬. আল-রেফায়ী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২।

৩৭. আল কুশায়রী, প্রাগুক্ত।

التصوف هو علم تعرف بها أحوال تزكية النفوس وتصفية الأخلاق
وتعمير الظاهر والباطن لنيل السعادة الأبدية "তাসাউফ হলো চিরস্থায়ী
সৌভাগ্য অর্জনের নিমিত্তে আত্মশুদ্ধি, চরিত্রগঠন, ভেতর ও বাইরের সংস্কার
পরিগঠনের নাম" ১৩৮ তিনি আরো বলেন, ويحصل به إصلاح النفس
والمعرفة ورضاء الرب.

"তাসাউফ দ্বারা নফসের সংশোধন, মারিফাত ও আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা
যায়" ১৩৯ হযরত ইমাম মারুফ কারখী (রহ.) বলেন, التصوف هو الأخذ
بالحقائق واليأس مما في يدي الخلائق.

"তাসাউফ হলো হাকীকতকে গ্রহণ করে মানুষের কাছে যা আছে সবকিছু
থেকে বিমুখ হওয়া" ১৪০ আল্লামা কুশায়রী (রহ.) বলেন, বাহ্যিক ও অন্তর
জীবনের বিশুদ্ধিই তাসাউফ। ১৪১ হযরত শায়খ আব্দুল কাদির জিলানী
(রহ.) বলেন، التصوف الصدق مع الحق وحسن الخلق مع الخلق.

"তাসাউফ হলো আল্লাহর সাথে সত্যপরায়ণ ও বান্দার সাথে সদাচরণের
নাম" ১৪২ শায়খ জুনায়েদ বাগদাদী (রহ.) বলেন، الصوفي أن يختصك
الله بالصف فمن اصطفى من كل ما سوي الله فهو الصوفي

"তাসাউফ হচ্ছে অন্তর গায়রুল্লাহর প্রভাবমুক্ত হয়ে পবিত্রতার জন্য
মনোনীত হওয়া" ১৪৩ আবুল হুসাইন আল-নূরী (রহ.) বলেন,
সুফিবাদ সমগ্র সত্তাকে পরিত্যাগ করে।

"ইন্দ্রিয় আত্মার কুপ্রবৃত্তির বিসর্জন হলো তাসাউফ" ১৪৪ ইমাম গাযালী
(রহ.) বলেন, আল্লাহ ব্যতীত অপর সব কিছু থেকে হৃদয়কে পবিত্র আল্লাহর
আরাধনায় নিমজ্জিত রাখা এবং সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর মধ্যে নিমগ্ন হওয়ার
অপর নামই সূফী দর্শন। অপর বর্ণনায় তিনি আরো বলেন, আল্লাহর উপর
পূর্ণ ভরসা করে সর্ব প্রকার বাতিল ধ্যান-ধারণা হতে মনকে মুক্ত করে নিষ্ঠার
সাথে ইবাদাতের মাধ্যমে আল্লাহর প্রেম অর্জন করাকে তাসাউফ বলে। ১৪৫
আল্লামা ইবনে উজাইবা (রহ.) বলেন,

১৩৮. খান, আল্লাহ ইয়ার, দালাইলুস সুলুক, মুরশিদবাদা, ইদারাত তালিফাতে উয়াইসিয়া,
১৯৯২ খ্রি, পৃ. ২৬।

১৩৯. প্রাগুক্ত।

১৪০. আল কাদেরী, ড. তাহের, অনু: মুহাম্মদ হাবীবুল্লাহ, তাসাউফের আসলরূপ, ঢাকা:
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ। ২০১২ইং, পৃ. ২১৭।

১৪১. আল কুশায়রী, প্রাগুক্ত।

সুফিবাদ এমন একটি বিজ্ঞান যা শেখায় কীভাবে রাজাধিরাজের সান্নিধ্যের দিকে অগ্রসর হতে হয়, অন্তরকে পাপ থেকে পরিশুদ্ধ করতে হয় এবং তাকে নানা পুণ্যে সজ্জিত করতে হয়। এর শুরু জ্ঞান, মধ্যভাগ কর্ম এবং পরিণাম এক আশীর্বাদ।

التصوف الصديق مع الحق وحسن الخلق مع الخلق.

"তাসাউফ হলো আল্লাহর সাথে সত্যপরায়াণ ও বান্দার সাথে সদাচরণের নাম"।^{৪২} শায়খ জুনায়েদ বাগদাদী (রহ.) বলেন, الصوفي أن يختصك الله بالصف فمن اصطفى من كل ما سوي الله فهو الصوفي.

"তাসাউফ হচ্ছে অন্তর গায়রুল্লাহর প্রভাবমুক্ত হয়ে পবিত্রতার জন্য মনোনীত হওয়া"।^{৪৩} আবুল হুসাইন আল-নূরী (রহ.) বলেন, التصوف ترك النفس جملة.

"ইন্দ্রিয় আত্মার কুপ্রবৃত্তির বিসর্জন হলো তাসাউফ"।^{৪৪} ইমাম গাযালী (রহ.) বলেন, আল্লাহ ব্যতীত অপর সব কিছু থেকে হৃদয়কে পবিত্র আল্লাহর আরাধনায় নিমজ্জিত রাখা এবং সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর মধ্যে নিমগ্ন হওয়ার অপর নামই সূফী দর্শন। অপর বর্ণনায় তিনি আরো বলেন, আল্লাহর উপর পূর্ণ ভরসা করে সর্ব প্রকার বাতিল ধ্যান-ধারণা হতে মনকে মুক্ত করে নিষ্ঠার সাথে ইবাদাতের মাধ্যমে আল্লাহর প্রেম অর্জন করাকে তাসাউফ বলে।^{৪৫}

আল্লামা ইবনে উজাইবা (রহ.) বলেন,

التصوف علم يعرف بها كيفية السلوك إلي حضرة الملك الملوك
وتصفية البواطن من الرذائل وتحليلتها بأنواع الفضائل فأوله علم
وأوسطه عمل وآخره موهبة.

"অন্তরকে অন্যায় ও অপরাধ মুক্ত করে বিভিন্ন ধরনের গুণাবলী দ্বারা সজ্জিত করতঃ আল্লাহর রাহে চলার পথ যে জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে জানা যায়, সে জ্ঞানকে তাসাউফ বলে। এর প্রথম ভাগ ইলম, মধ্য ভাগ আমল এবং শেষ ভাগ হলো আল্লাহর বিশেষ দান"।^{৪৬}

৪২. জিলানী, শায়খ আবদুল কাদির, গুনিয়াতুত তাল্লিবীন।

৪৩. আফিফী, আবুল আলা, ফী তাসাওউফিল ইসলামী, কায়রো, পৃ. ২৮।

৪৪. হাই, সাইয়েদ আব্দুল, মুসলিম দর্শন, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮২।

৪৫. আফিফী, প্রাগুক্ত।

৪৬. আল-রেফায়ী প্রাগুক্ত।

তাসাওউফের সংজ্ঞায় প্রায় দু'হাজার মত পাওয়া গেলেও উপরোক্ত সংজ্ঞাটি সর্বোৎকৃষ্ট ও সমৃদ্ধ বলেছেন আল্লামা ইবনে উজাইবা (রহ.)। তিনি বলেন, للتصوف تعاريف كثيرة بلغت الفين أحسنها أجمعها هذا التعريف "তাসাওউফের সংজ্ঞার সংখ্যা দু'হাজার হলেও সর্বাধিক সুন্দর ও সমৃদ্ধ হলো এই সংজ্ঞাটি"।^{৪৭}

অতএব, উপরোক্ত সংজ্ঞার আলোকে আমরা বলতে পারি, তাসাউফ হলো সেই পথ, যে পথে চলে আল্লাহর সাধারণ বান্দাগণ তাঁর প্রিয় বান্দার কাতারে शामिल হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করতে সক্ষম হয়। আর সে পথই হলো সিরাতুল মুস্তাকীম বা সরল সঠিক পথ। যে পথের দিশা পাওয়ার প্রার্থনা করে প্রতিটি মুসল্লীগণ। নামাযের প্রতি রাকাআতে বলে থাকেন المَدَنُ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ "আমাদেরকে সরল সঠিক পথ প্রদর্শন করুন"।

^{৪৮} আর সেই সরল পথ কোনটি তা চিহ্নিত করে মুসল্লীগণ বলে থাকেন صِرَاطُ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ

"সেই পথ যে পথের অনুসারীদের নিআমত দান করেছেন"।^{৪৯} আল্লাহর সেই নিআমতপ্রাপ্ত বান্দা কারা তাদের পরিচয় দিয়ে মহান আল্লাহ বলেন,

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا "যারা আনুগত্য করে আল্লাহ ও রাসূল (সা.)-এর তারা ঐসব বান্দাদের সাথী হবে, যাদের উপর আল্লাহ নিআমত দান করেছেন। আর তারা হলেন নবীগন, সিদ্দীকগণ, শহীদগণ এবং সৎকর্মশীল ব্যক্তিবর্গ। আর তারাই সর্বোত্তম বন্ধু"।^{৫০} আর ঐ নিআমত আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ এক অনুগ্রহ এ ঘোষণা দিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন, ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عِلِمًا "আর তা আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ দান-অনুগ্রহ, সর্বাধিক জ্ঞাত হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট"।^{৫১} বস্তুত এ পথে নিআমত প্রাপ্তিই হলো সিরাতুল মুস্তাকীমের উপর চলার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

^{৪৭} . প্রাপ্ত।

^{৪৮} . আল কুরআন, সূরা ফাতিহা, ১:৫।

^{৪৯} . আল কুরআন, সূরা ফাতিহা, ১: ৬।

^{৫০} . আল কুরআন, সূরা নিসা, ৪: ৬৯।

^{৫১} . আল কুরআন, সূরা নিসা, ৪: ৭০।

তাই আল্লাহ তা'আলা সিরাতুল মুস্তাকিম প্রদর্শনের ঘোষণা দিয়ে ইরশাদ করেন, وَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا "আমি অবশ্যই তাদেরকে সীরাতুল মুস্তাকীম তথা সরল সঠিক পথ প্রদর্শন করবো"।^{৫২}

সুতরাং আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে তাঁর যাবতীয় আদেশ-নিষেধ পালন ও রাসূল (সা.)-এর সুন্নাহের যথার্থ অনুসরণ করার নামই হলো তাসাউফ। এতদভিন্ন যাবতীয় বিষয় তাসাউফ হিসেবে গণ্য হওয়ার পথে মৌল বাধা। ইসলামী শরী'আতের পরিপূর্ণ বাস্তবায়নই তাসাউফের মৌলিক কাজ, আল্লাহ তা'আলার মা'রিফতাই চূড়ান্ত লক্ষ্য আর এ পথে বিভিন্ন নিআমত লাভ আল্লাহর বিশেষ পুরস্কার হিসেবে বিবেচ্য।

তাসাউফের গুরুত্ব

মহান আল্লাহ তাঁর ঈমানদার বান্দাদেরকে প্রিয়তম বান্দা হওয়ার পথ প্রদর্শন করে তাঁর নৈকট্য হাসিলের নির্দেশ করেছেন। তিনি ইরশাদ করেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ "হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় এবং সত্যবাদীগণের সান্নিধ্য গ্রহণ কর"।^{৫৩} তিনি আরো ইরশাদ

করেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ "হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে যেভাবে ভয় করা উচিত সে ভাবে কর (চূড়ান্তরূপে)"।^{৫৪}

উপরোক্ত আয়াত দুটিতে আল্লাহকে ভয় করার কথা ইরশাদ হয়েছে ও শেষে আয়াতে চূড়ান্তভাবে ভয় করার কথা বলেছেন। এর ব্যাখ্যায় মুফাসসিরগণ সর্বদা আল্লাহর প্রেম সাগরে ডুবে থাকা তাকওয়ার চূড়ান্ত পর্যায় হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। কাযী নাসিরুদ্দীন বায়জাভী বলেছেন, أن ينتزعه عما يشغل سره عن الحق ويتبتل إليه بسرائره وهو التقوي الحقيقي المطلوب.

^{৫২} . আল কুরআন, সূরা নিসা, ৪: ৬৮।

^{৫৩} . আল কুরআন, সূরা তাওবা, ৯: ১১৯।

^{৫৪} . আল কুরআন, সূরা আলে ইমরান, ৩: ১০২।

"এমন জিনিস থেকে দূরে থাকা যা তার (বান্দার) অন্তরকে হক (আল্লাহ) থেকে গাফেল করে দেয় এবং সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর দিকে মনোনিবেশ করে দেয়, তাহলো কাক্সিত প্রকৃত তাকওয়া"।^{৫৫}

প্রথম আয়াতেও الصَّادِقِينَ وَكُونُوا বলে তাকওয়ার সেই চূড়ান্ত পর্যায়ের দিকে নির্দেশ করেছেন, যা সত্যবাদীদের (সাদেকীন) সংসর্গে সহজে হাসিল হয়। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ "হে ঈমানদারগণ। আল্লাহকে ভয় করো, সন্ধান করো ওয়াসীলা (মাধ্যম) তার নিকট এবং তাঁর পথে মুজাহাদা (সর্বাত্মক চেষ্টা) করো যাতে তোমরা সাফল্য লাভ করো"।^{৫৬} এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তিনটি বিষয়ের আদেশ করেছেন। ১. তাকওয়া বা আল্লাহ ভীতি। ২. ওয়াসীলা বা মাধ্যম সন্ধান। ৩. মুজাহাদা বা সর্বাত্মক সাধনা।

তাসাউফের প্রয়োজনীয়তা

উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহণের নিমিত্তে মানবজীবনে তাসাউফের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। বস্তুত দেহ ও অন্তরের সমন্বয়ে মানুষ গঠিত। দেহ হলো মানুষের হাত-পা, মাথা, বুক ইত্যাদি নানা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সমষ্টি। আর অন্তর হলো আত্মা বা ক্বালব। এ দু'টোর মধ্যে জ্বালবের সংশোধন প্রয়োজন। আর কলবের সংশোধনই হলো আত্মশুদ্ধি। যার অর্থ নিজের সংশোধন, নিজেকে খাঁটি করা, পরিশুদ্ধ করা ইত্যাদি। ইসলামী শরী'আতে এটি একটি আদর্শিক পরিভাষা। আরবীতে বলা হয় 'তায়কিয়াতুন নাফ'। 'তায়কিয়াহ'-এর শাব্দিক অর্থ পবিত্র করা, পরিশুদ্ধ করা, বৃদ্ধি করা। আল মাওসু'আতুল 'আরাবিয়াহ (الموسوعة العربية) গ্রন্থকার বলেন, والمراد بها إصلاح النفوس وتطهيرها عن طريق العلم النافع والعمل الصالح من فعل المأمورات وترك المحظورات "তাকিয়াহ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো উপকারী ইলম, সং কর্ম ও যাবতীয় করণীয় সম্পাদন ও বর্জনীয় পরিত্যাগ করার মাধ্যমে নাক্সকে পবিত্র ও বিশুদ্ধকরণ"।^{৫৭} ড. আহমাদ

^{৫৫} . আল শাফেয়ী কাযি নাসিরুদ্দীন আল বায়জাজী, তাফস্টরে বায়জাবী, আল মাকতাবাহ আততাওফিকিয়াহ, তারিখবিহীন/২৪।

^{৫৬} . আল কুরআন, সূরা আল মায়িদা, ৫: ৩৫।

^{৫৭} . আযীয, ড. আব্দুল, রিয়াছ: দারুল ওয়াতান লিন্ নাশরি, মা' আলিমুন ফিস সুলুক ওয়া তায়কিয়াতুন নুস, তা. বি. খ. ১, পৃ. ৪৬)

التزكية تطهير الإنسان ظاهراً وباطناً من دنس الذنوب والمعاصي والأثام.

"সকল পাপাচার ও অবাধ্যতা থেকে মানুষের বাহ্যিক এবং অভ্যন্তরীণ পবিত্রতা অর্জন করার নাম আত্মশুদ্ধি"।^{৫৮} বিশিষ্ট মুফাচ্ছির আল্লামা আলুসী (রহ.) বলেন,

الاستقامة على التوحيد وإخلاص العمل لله تعالى والتبري عن الشرك.
"তাওহীদের পথে স্থিরতা, আল্লাহর জন্যই একনিষ্ঠ আমল এবং শিরক থেকে বেঁচে থাকাই আত্মশুদ্ধি"।^{৫৯} কালব যদি সৎ ও ভালো কাজের নির্দেশ দেয় তবে দেহ ভালো কাজ করে। এ বিষয়ে মহানবী (সা.) বলেন,
أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضَغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ...
"জেনে রেখো! শরীরে একটি মাংসপিণ্ড রয়েছে। তা সংশোধিত হলে, তবে গোটা শরীরই সংশোধিত হবে। আর যদি তা কলুষিত হয়, তবে গোটা শরীরই কলুষিত হয়। মনে রেখো! তা হলো ক্লাব্ব বা

অন্তর"।^{৬০} আল্লাহ তা'আলা মানুষকে তাঁর ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। আর ইবাদতের পূর্বশর্ত হলো পবিত্রতা। তিনি পবিত্রতা ব্যতীত কোনো জিনিসই কবুল করেন না। সুতরাং ইবাদতের জন্যও দেহ-মন পবিত্র হওয়া আবশ্যিক। শুধুমাত্র দৈহিক পবিত্রতা লাভ করলেই হবে না বরং অন্তরকেও পবিত্র করতে হয়। কলুষিতকারী সব কিছু থেকে মনকে পবিত্র রেখে কেবল মহান আল্লাহর সম্ভৃষ্টির জন্য ইবাদত করতে হয়। আর আত্মার পবিত্রতা আত্মশুদ্ধির মাধ্যমেই অর্জন করা সম্ভব। মানুষের আত্মিক উন্নতি, প্রশান্তি ও বিকাশ সাধনের জন্যও আত্মশুদ্ধির গুরুত্ব অপরিসীম। আত্মশুদ্ধি মানুষের নৈতিক ও মানবিক গুণাবলির বিকাশ ঘটায়। সর্বদা ভালো চিন্তা ও সৎকর্মে উৎসাহিত করে। আত্মশুদ্ধি মানুষের চরিত্রে প্রশংসনীয় গুণাবলির চর্চা করে। পক্ষান্তরে যার আত্মা কলুষিত সে নানাবিধ পাপ চিন্তা ও অশ্লীল কাজে লিপ্ত থাকে। সে অন্যায় অত্যাচার, সন্ত্রাস-নির্যাতন করতে দ্বিধাবোধ করে না।

^{৫৮} . ইবনু শিরশাল, ড. আহমাদ, উসুলুত তালীম ওয়াত তারবিয়াহ (মাজাল্লাতুল বায়ান), রিয়াদ: আল মুনতাদা আল ইসলামী, সংখ্যা-১৩০, পৃ.

^{৫৯} . আলুসী, শিহাবুদ্দীন মাহমুদ, রুহুল মা' আনী, বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, ১৪১৫ হি. খ. ১২, পৃ. ৩৫১।

^{৬০} . বুখারী, আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাইল, সহীহুল বুখারী, কায়রো: দারুল শা'ব, ১ম সংস্করণ, ১৪০৭ হি. খ. ১, পৃ. ২০।

ফলে সামাজিক শান্তি-শৃঙ্খলাও বিনষ্ট হয়। অতএব নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধ রক্ষা ও বিকাশের জন্য 'আত্মশুদ্ধির বিজ্ঞান' তাসাওউফের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। মহান আল্লাহ বলেন,

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ * إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ

"সে দিন ধন-সম্পদ এবং সন্তান-সন্ততি কোন উপকারে আসবেনা। তবে, সেই ব্যক্তি যে আল্লাহ তা'আলার সম্মুখে হাজির হয়েছে বিশুদ্ধ (পবিত্র) কুলব নিয়ে (সে মুক্তি পাবে)"।^{৬১} উপরোক্ত আয়াতে 'ক্বালবে সালীম' এর ব্যাখ্যায় আলুসী (রহ.) বলেছেন, بقلب سليم عن مرض الكفر والنفاق.

"জ্বলবে সালীম বা বিশুদ্ধ অন্তর হলো যা কুফরী ও কপটতার ব্যাধি থেকে পবিত্র"।^{৬২} আর এ প্রকার ক্বালব সৎ কর্মের অনুগামী হয়ে থাকে। কারণ ক্বলব বিশুদ্ধ হওয়ার নিদর্শন হল তার প্রভাব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে পতিত হওয়া ও সঠিক কর্ম সম্পাদন করা। শায়খ জুনাইদ বোগদাদী (রহ.) বলেছেন, "রাসূলকে (সা.) মহান আল্লাহ তা'আলা যে সকল মহান দায়িত্ব দিয়ে প্রেরণ করেছেন, তন্মধ্যে দ্বিতীয় দায়িত্ব ছিল তাকিয়া বা মানুষকে আত্মকভাবে পবিত্র করা"। আল্লামা ইবনু কাসীর (রহ.) 'তায়কিয়া' শব্দের তাফসীর করতে গিয়ে বলেন,

(ويزكيهم) أي يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر لتزكو نفوسهم، وتطهر من الدنس والخبث الذي كانوا متلبسين به في حال شركهم وجاهليتهم

"তিনি তাদেরকে পরিশুদ্ধ করেন অর্থাৎ তিনি তাদেরকে সৎ কাজের আদেশ দেন, গর্হিত কাজ হতে বিরত রাখেন। যেন অন্তরসমূহ আত্মশুদ্ধি অর্জন করতে পারে এবং পবিত্র ও কলুষমুক্ত হতে পারে। যার সাথে তারা মুশরিক এবং জাহিল অবস্থায় জড়িয়ে পড়েছিল"।^{৬৩} শায়খুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়াহ (রহ.) বলেন,

والأعمال الظاهرة لا تكون صالحة مقبولة إلا بتوسط عمل القلب: فإن القلب ملك والأعضاء جنوده فإذا خبث الملك خبثت جنوده، ولهذا قال

৬১. আল কুরআন, সূরা আশ শু'আরা, ২৬:৮৮-৮৯।

৬২. আলুসী, শিহাবুদ্দীন মাহমুদ, রুহুল মা' আনী, কায়রো: আল মাকতাবাতুহ তাওফীকিয়াহ, ২০০৮ খ্রি. খ. ১০, পৃ. ৪৮২।

৬৩. ইবনু কাসীর, আবুল ফিদা ইমাদুদ্দীন তাফসীরুল কুরআনিল 'আযীম, কায়রো: মাকতাবাতুস সাফা, ১ম সংস্করণ, ২০০৪ খ্রি. খ. ২, পৃ. ৯৪।

النبي - - - : ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله؛ وكذلك أعمال القلب لا بد أن تؤثر في عمل الجسد. "অন্তর ক্রিয়ার আলোকেই বাহ্যিক আমল গ্রহণযোগ্য হয়। কারণ আত্মা হলো শাসকের ন্যায়; আর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সেনাবাহিনীর ভূমিকায়। শাসক যখন দুষ্কর্মা হয়, তার বাহিনীও দুষ্কর্মা হয়ে পড়ে। এ কারণে রাসূল (সা.) বলেছেন, সাবধান! দেহে এমন একটি মাংসপিণ্ড রয়েছে, যখন এটি সঠিক হয়, তখন পুরো দেহটাই সঠিক হয়ে যায়। আর যখন এটি নষ্ট হয়, তখন পুরো দেহটাই বিনষ্ট হয়ে যায়"। আল্লামা ইবনু তাইমিয়া (রহ.) বলেন, "এভাবে আত্মার সমূহ ক্রিয়া দেহের ক্রিয়াতে অপরিহার্যভাবে প্রভাব বিস্তার করে"।^{৬৪} আল্লামা ইজ্জুদীন (রহ.) বলেন,

وليست الحقيقة خارجة عن الشريعة بل الشريعة طافحة بإصلاح القلوب بالمعارف والأحوال والعزوم والنيات وغير ذلك مما ذكرناه من أعمال القلوب، فمعرفة أحكام الظواهر معرفة لجل الشرع، ومعرفة أحكام البواطن معرفة لدق الشريعة، ولا ينكر شيئاً منها إلا كافر أو فاجر.

"হাক্কীকত শরী'আত বর্হিভূত কোন দিক নয়; বরং শরী'আ পরিপূর্ণ হয় মা'রিফাত, আহওয়াল, দৃঢ় সংকল্প ও অভিপ্রায় ইত্যাদি আলোচিত জ্বলবের কার্যাদির মাধ্যমে আত্মার বিশুদ্ধকরণে শরী'আত পরিপূর্ণ। অতএব, (শরী'আতের) বাহ্যিক বিধান জানা মানে শরী'আতের মহত্ব সম্পর্কে জানা। আর বাতিনী বিষয়াবলির বিধান জানা মানে শরী'আতের রহস্য জানা। কাফির কিংবা ফাজির (পাপিষ্ঠ) ব্যতীত কেউ এর কোনটিকে অস্বীকার করতে পারে না"।^{৬৫} আধুনিক ইসলামী চিন্তাবিদ সাইয়িদ কুতুব (রহ.) বলেন,

ولا قيمة ولا وزن في نظر الإسلام للانتصار العسكري أو السياسي أو الاقتصادي، ما لم يقم هذا كله على أساس المنهج الرباني في الانتصار على النفس والغلبة على الهوى والفوز على الشهوة.

"ইসলামের দৃষ্টিতে সামরিক কিংবা রাজনৈতিক কিংবা অর্থনৈতিক বিজয়ের কোন গুরুত্ব নেই, যতক্ষণ না এসব কিছু আল্লাহ প্রদত্ত পদ্ধতিতে মনের কু-

^{৬৪} . ইবনু তাইমিয়াহ, তাক্বীউদ্দীন, মাজমু' উল ফাতাওয়া, মদীনা মুনাওয়ারাহ: ইসলামী দা'ওয়াহ ও ওয়াকফ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ১৪২৫ হি./২০০৪ খ্রি . খ. ১১, পৃ. ৩৮১।

^{৬৫} . ইজ্জুদীন, আবু মুহাম্মাদ আব্দুস সালাম, ক্বাওয়ায়িদুল আহকাম ফী মাসালিহিল আনাম, বৈরুত: দারুল মা'আরিফ, তা. বি. খ. ২, পৃ. ১৭৯।

প্রবৃত্তি ও কামনা-বাসনার বিরুদ্ধে বিজয় না হবে"।^{৬৬} সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নাদভী (রহ.) বলেন,

وجدنا القرآن ينوه بشعبة من شعب الدين ومهمة من مهمات النبوة يعبر عنها بلفظ (التزكية) فالتزكية والإحسان وفقه الباطن حقائق شرعية علمية ومفاهيم دينية ثابتة من الكتاب والسنة يقر بها المسلمون جميعاً.

"আমরা দেখতে পাই যে, পবিত্র কুরআন দীনের সমূহ শাখার বিশেষ একটি শাখা এবং নুবুওয়াতের বিশেষ একটি মিশনের প্রতি খুব বেশি গুরুত্বারোপ করতে, যাকে 'তায়কিয়া' নামে অভিহিত করা হয়। অতএব তায়কিয়া, সদাচরণ, গোপন বিষয় অনুধাবন শরী'আতের মূল হাক্কীকত এবং দীনের বক্তব্য কুরআন-সুন্নাহ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এবং মুসলিম উম্মাহ কর্তৃক স্বীকৃত"। তিনি আরো বলেন,

التزكية ... روح الشريعة ولب لباب الدين وحاجة الحياة، فلا كمال للدين ولا صلاح للحياة الاجتماعية، ولا لذة - بالمعنى الحقيقي - في الحياة الفردية إلا بتحقيق هذه الشعبة من الحياة.

"তায়কিয়া" হলো শরী'আতের প্রাণ, দীনের সারাংশ এবং জীবনের অপরিহার্য অঙ্গ। সুতরাং জীবনের এ শাখাটির বাস্তবায়ন ব্যতীত দীন পরিপূর্ণতা লাভ করবে না। সমাজ জীবন উপযোগিতা লাভ করবে না এবং ব্যক্তি জীবন প্রকৃত স্বাদ আনন্দন করতে পারবে না"।^{৬৭} অতএব দ্বীনের পরিপূর্ণতা সাধনের নিমিত্তে এবং ঈমানের স্বাদ আনন্দনের লক্ষ্যে তাসাওউফের অপরিহার্যতা সু-প্রমাণিত।

উপসংহার

ঈরিশেষে উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা সুস্পষ্টভাবে বলতে পারি যে, আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের মানসে মহাবনী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর অনুসৃত রীতিনীতি ও আদর্শের পূর্ণ অনুকরণই তাসাউফ একমাত্র ভিত্তি। যাবতীয় পাপ-পংকিলতা ও কলুষতা থেকে নিজ কালবকে মুক্ত করে এবং আল্লাহর প্রেমে উদ্দীপ্ত হয়ে একমাত্র তাঁরই সম্ভষ্টির উদ্দেশ্যে জীবনের প্রতিটি কাজ সম্পাদন করা একজন প্রকৃত তাসাউফ অনুসারীর অন্যতম কর্তব্য। মহানবী (সা.)-এর সুহবতপ্রাপ্ত সাহাবীগণ আল্লাহর প্রেমে উদ্ভুদ্ধ হয়ে তাদের

৬৬. কুতুব, সাইয়িদ ইব্রাহীম, ফী যিলালিল কুরআন, কায়রো: দারুলশ শুরক, তা. বি. খ. ১, পৃ. ৪৫৯।

৬৭. নাদভী, সাইয়িদ আবুল হাসান আলী, রব্বানিয়াহ লা-রহবানিয়াহ, বৈরুত: দারুল ফাতহ লি'ত্বা'আহু ওয়ান নাশার, ১ম সংস্করণ, ১৩৮৬ হি./১৯৬৬ খ্রি. পৃ. ১০-১২।

জীবনের সর্বক্ষেত্রে তাঁরই সুন্নাহ্ অনুসরণ করেছেন পূর্ণাঙ্গরূপে। ফলে তাঁরই আল্লাহর সন্তুষ্টিপ্রাপ্ত বান্দা হিসেবে ঘোষিত হয়েছেন মহাশু আল কুরআনে। সাহাবীগণের ন্যায় যারা কোন রাসূল (সা.)-এর প্রতিনিধির ও কুরআন-সুন্নাহর বাস্তব অনুসরণ করে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করেন তাঁরই প্রকৃত তাসাওউফের অনুসারী সূফী। কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী শিরক, বিদআত ও শরীআত বিরোধী আদর্শের অনুসরণ প্রকৃত সূফী।

লেখক : অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

ইলমে তাসাউফ বা তরীকত শিক্ষার গুরুত্ব

মুহাম্মদ হাফিজুল হক নিজামী

بسم الله الرحمن الرحيم

العلم التصوف : قال العلامة ابن عابدين التصوف هو علم يعرف به أنواع الفضائل وكيفية اكتسابها وأنواع الرزائل وكيفية أجتنا بها (رد المختار)

ইলমে তাসাউফ সম্পর্কে আল্লামা ইবনে আবেদীন বলেন, ইহা এমন জ্ঞান যার দ্বারা সৎগুণ সমূহের পরিচিতি লাভ করা যায় এবং উহা অর্জনের উপায় সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়। ইলমে তাসাউফ অর্জন করার ব্যাপারে মুহাক্কিক ওলামায়ে কেরামের মতামত

قال محمد بن علي بن محمد بن عبد الرحمن الحصكفي الحنفى رح هو فرض عين وفرض كفاية ومستحب (در المختار ص ১-৩১)

তিনি বলেন, যে পরিমাণ তাসাউফ শিক্ষার দ্বারা মানুষের চরিত্র বিশুদ্ধ ও মার্জিত হতে পারে ততটুকু ইলমে তাসাউফ শিক্ষা করা ফরজে আইন। আর যে পরিমাণ তাসাউফ শিক্ষা করার দ্বারা অন্যকে ও তালিম দেওয়া যায়, সে পরিমাণ শিক্ষা অর্জন করা ফরজে কেফায়া। আর যে পরিমাণ শিক্ষার ফলে ইলমে তাসাউফের অগাধ জ্ঞান লাভ করা যায় সে পরিমাণ জ্ঞান অর্জন করা মুবাহ।

وقال مجد الدين أبو السعد ابن الاثير الجزرى رح في جامع الاصول في احاديث الرسول، واعلم أن العلم الباطن الذي هو من أعظم المنجيات والسلوك والرياضيات والمجاهدات فرض عين على من لم يرزق قلبا سليما بالجزب الالهى (جامع الاصول، ص ২২৬)

আল্লামা ইবনুল আসীর যজরী (রহঃ) বলেন, যেনে রেখ, আধ্যাত্মিক জ্ঞান যাহা সর্বোত্তম মুক্তির পথ এবং রিয়াযত ও মুজাহেদার পথ ফরজে আইন, তার জন্য যে যজবে ইলাহী এর মাধ্যমে “কলবে সলিম” অর্জন করতে সক্ষম হয় নাই। একটি সহীহ হাদিসের পর্যালোচনা

عن ابى سعيد الخدرى رض قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم، (جامع صغير لالسيوطى رقم ৫২৬৬، والطبراني في الأوسط رقم ৮৫৭৬، بيهقى فى شعب الإيمان رقم ১৬৬৭)

রাসূল (সাঃ) এরশাদ করেন, জ্ঞান অর্জন করা ফরজ প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর জন্য। এ হাদিসের ব্যাখ্যায় মুহাদ্দেসীনে কেরামের মতামত

فعن الحسن البصري رضي الله عنه قال العلم علمان، علم قلب ولذلك العلم النافع
وعلم على اللسان فذلك حجة الله عز وجل على ابن آدم (دارمي مرقاة)
ورواه ابن عبد البر باسناد صحيح عن الحسن مرسلا وقد حسنه
السيوطي في جامع صغير وقال المنذري إسناده صحيح

হযরত হাসন বসরি (রাঃ) বলেন ইলম দুই প্রকার। একটি হল কলবের
(তথা ইলমে বাতেন) অন্যটি জোবান দ্বারা পড়ে আয়ত্ত্ব করা জ্ঞান। যাহা
বনি আদমের উপর আল্লাহর দলিল।

وقال صاحب الروح البيان العلامة اسماعيل حقي وصاحب السر
الأسرار الشيخ محي الدين عبد القادر جيلاني،،ان يطلب الظاهر
والباطن كلاهما فرض

আল্লামা ইসমাইল হক্কী ও শায়খ আবদুল কাদের জিলানি, উল্লেখিত দুটি
হাদিস দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, জাহেরী ও বাতেনী উভয় প্রকার জ্ঞান
অর্জন করা ফরজ।

وقال ملا علي قارئ رح معنى العلم المعرفة والشرعية ثم قال انه لا
يتحقق شيء من علم الباطن إلا بعد التحقق بإصلاح الظاهر، كما أن علم
الظاهر لا يتم إلا بإصلاح الباطن وكذا قال الإمام مالك رح من تفقه ولم
يتصوف فقد تنفسق ومن تصوف ولم يتفقه فقد تذوق ومن جمع بينهما فقد
تحقق (مرقاة ج ١)

মোল্লা আলী কারী (রহ.) বলেন, ইলমে বাতেন বা তাসাউফ শিক্ষা কখনো
যথাযথ প্রতিষ্ঠিত হবেনা পরিশুদ্ধ ভাবে জাহেরী ইলম প্রতিষ্ঠিত না হওয়া
পর্যন্ত। ঠিক তেমনি ভাবে জাহেরী ইলম (শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নের
মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞান) পরিপূর্ণ হবে না ইলমে বাতেন পরিশুদ্ধ না হওয়া
পর্যন্ত। তিনি বলেন, একথাটিই ইমাম মালেক (রহ.) নিম্নোক্ত বাক্যে
বলেছেন, যে ব্যক্তি কোরআন সুন্নাহর জ্ঞান অর্জন করেছে অথচ ইলমে
তাসাউফ অর্জন করেনি সে ফাসিক। আর যে ব্যক্তি শুধু তাসাউফের জ্ঞান
অর্জন করেছে কোরআন সুন্নাহর জ্ঞান অর্জন করনি সে জিন্দিক তথা
নাশ্তিক। আর যে উভয় জ্ঞানের মধ্যে সমন্বয় সাধন করেছে সে পরিপূর্ণতা
অর্জন করেছে।

وقال أبو طالب المكي رح هما علمان أصليان لا يتغنى أحدهما عن
الأخر كالإسلام والإيمان مرطب على كل منهما بالآخر و كالجسم
والقلب لا ينفك أحد أن صاحبه

قال عمر بن عبد العزيز رض ان للايمان فرائض وشرايع وحدودا وسننا
فمنستكملها استكمل الايمان ومن لم يستكملها لم يستكمل الايمان، بخارى
جلد ١

হযরত উমর ইবনে আব্দুল আজীজ বলেন, ঈমানের মধ্যে কতগুলো ফরজ, শরীয়তের বিধিবিধানের হুকুম, শান্তির বিধান এবং কতিপয় সুন্নত সমুহ তথা যাবতীয় নফল, মুস্তাহাব ও মুবাহ রয়েছে। যে ব্যক্তি উক্ত সবগুলো পালন ও পরিপূর্ণ করবে সে ঈমান পূর্ণ করবে। আর যে ব্যক্তি তার সবগুলো পূর্ণ করবে না, সে ঈমান ও পূর্ণ করল না। (বুখারি)
এখানে নফল ইবাদত বলতে ইলমে তাসাউফ এর দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

وقال الإمام البخاري فاذا تراك شيئا من الكمال وهو ناقص بخارى ج ١
ص ١١

ইমাম বুখারি (রহ.) বলেন, যখন কামেল বা পরিপূর্ণতা থেকে কোন একটা অংশ বাদ দেওয়া হয় তখন উহা নাকেস বা অপূর্ণ হয়ে যায়। অতএব ইসলাম যেহেতু পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা, তাই সেখানথেকে যদি তাসাউফকে বাদ দেওয়া হয় তাহলে তা অপূর্ণ হয়ে যাবে।

فلهذا قال الشاه ولي الله محدث الدهلوى رح التصوف بالنسبة الى
السنائر الشريعة بمنزلة الروح والجسد وبمنزلة المعنى من اللفظ،
التفهيمات الالهيه، ج ١ ص ١٢

এ জন্য উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস আল্লামা শাহ ওলিউল্লাহ দেহলভী রহ. বলেছেন, শরীয়তের যাবতীয় বিধানের মধ্যে তাসাউফের সম্পর্ক হল রহ, এবং শরীরের মত, এবং বাক্যের মধ্যে শব্দ ও অর্থের মত অবিচ্ছেদ্য। হযরত ইমামো আজম আবু হানিফা (রহ.) ইলমে তাসাউফ কে ফিকাহ শাস্ত্রের পর্যায়ভুক্ত করেছেন। তিনি বলেছেন,

الفقه تصوية الباطن

অর্থাৎ ফিকাহ অন্তরাত্মকে পরিশুদ্ধ করে। ইহা ছাড়া ও তাওজীহ নামক কিতাবের মর্মে জানা যায়,

وأبو حنيفة رحمه الله إنما لم يزيد عملا لأنه أراد الشمول أي أطلق الفقه
على العلم بما لها وعليها سواء كان من الاعتقادات او الوجدانيات او
العمليات ثم سم الكلام فقها اكبر(شرح تلويح على التوضيح جلد
١ ص ٢٤)

হযরত ইমাম আবু হনিফা (রহ.) ফিকহের সংজ্ঞায় শুধু ইন্দ্রিয় ঘটিত বাহ্যিক আমল কে সীমাবদ্ধ করেন নাই। যেহেতু তিনি আকায়েদ ও তাসাউফ কে ফিকহের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। তিনি ফিকহের অর্থ লিখিয়াছেন যাহা দ্বারা লাভ ও ক্ষতি পরিমাণ করা যায়, চাই উহা আকাঈদ, তাসাউফ কিংবা বাহ্যিক আমল বিষয়ক হউক।

কাজী ছনাউল্লাহ (রহ.) শ্বীয় তাফসীর মাযহারীতে সূরা তাওবার ১২২নং আয়াত

فلو لا نفر من كل فرقة طائفة ليتفوها في الدين

আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন,

وأما العلم الدنى الذي يسمون أهل الصوفية الكرام فهو فرض العين لأن من ثمراتها تصفية القلب عن الاشتغال بغير الله تعالى و تصافه بدوام الحضور و تزكية النفس عن الرزائل الأخلاق من العجب والكبر والحسد وحب الدنيا والكسل والاخلاص والطاعات وإيثار الشهوات والرياء والسمعة وغير ذلك ،

যে সকল লোক ইলমে লদুনী বা ইলমে তাসাউফ লাভ করিয়াছেন, তাহারা সম্মানিত সুফি পদ বাচ্য হইয়া থাকেন। উহা শিক্ষা করা ফরজে আইন। যেহেতু উক্ত ইলম মনকে অন্যদিক হইতে খোদার লিপ্ত রাখে এবং খোদা তাআলাকে সর্বদা হাজের নাজের স্মরণ করাইয়া দেয়। এতদ্ব্যতিত নিম্নলিখিত মন্দ গুণ সমূহ যথা, ইবাদাতে গর্ব, অহংকার, হিংসা, দুনিয়া প্রীতি, অলসতা, মনখাটি নাহওয়া, ভোগ বিলাসী হওয়া, রিয়া, সুখ্যাতির, আখাংকা, যাবতীয় কু-প্রভৃতি হইতে মনকে পবিত্র রাখে। পক্ষান্তরে আবার নিম্নলিখিত পবিত্র গুণগুলি যথা-তাওবা আল্লাহর ইচ্ছায় রাজী থাকা, নেয়ামতের শোকর, বিপদে ধৈর্য্যশীলতা প্রভৃতি গুণগুলি মনকে সুসজ্জিত করে। হযরত ইমাম রব্বানী মুজাদ্দিদে আলফে সানী (রহ.) বলেন, হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর হাদিস, আলেমগণ নবীগনের ওয়ারিশ, আশ্বিয়া (আ.) যে ইলম পৃথিবীতে রেখেগেছেন উহা দুই ভাগে বিভক্ত। ১ম ইলমে শরিয়াহ, ২য় ইলমে আসরার। যিনি এই দুই জ্ঞানের অধিকারী হয়েছেন তিনি প্রকৃত ওয়ারিসাতুল আশ্বিয়া। আর যিনি মাত্র এক প্রকারের ইলমের অধিকারী হয়েছেন তিনি নবীদের যথার্থ ওয়ারিস নন।

ইহা ছাড়া কুরআনুল কারিমের আয়াতঃ

يا أيها الذين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين

হে ঈমানদার লোকেরা আল্লাহ কে ভয় কর এবং সাদেকীনদের সোহবত গ্রহণ কর। এ আয়তের ব্যাখ্যায় হযরত হাসান বসরী রহ.বলেন

إن أردت أن تكون مع الصادقين فعليك بالزهد في الدنيا والكف عن أهل الملة (ابن كثير)

যদি তুমি সাদেকীনদের অন্তর্ভুক্ত হতে চাও তাহলে দুনিয়ার মোহ ত্যাগ করা তোমার জন্য কর্তব্য এবং সাধারণ জনগণের কাছ থেকে দূরে থাকা অর্থাৎ বিনা প্রয়োজনে মিলামিশা ত্যাগ করা। এখানে صادقين এর অর্থ তাসাউফ পন্থী ওলামা ও অউলিয়ায়ে কেরামদের বুঝানো হয়েছে।

وقال ابن جرير طبري رح،،كونوا في الدنيا من اهل ولاية الله وطاعته تكونوا في الآخرة مع الصادقين في الجنة باتقياء الله

আল্লামা ইবনে জরীর তাবারী রহ.বলেন, তোমরা আল্লাহর দুনিয়াতে ওলীদের সাহচর্য্য গ্রহণ কর, তাহলে আখিরাতে সাদেকীনও মুত্তাকীদের সাথে জান্নাতে যেতে পারবে।

قال الدكتور الشيخ محمد تنتوي رح الامام الازهر الشريف:

الصوفيون هم يؤمنون بالله ورسله وملائكته وكتبه اليوم الآخر يتبعون في أقوالهم وأفعالهم الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويجتمعون للذكر وعبادة الله فلا يجوز ان غتبهم ويسبهم

আল্লামা ড. শায়খ আহমাদ তানতুবী রহ. (মিশরের আল আজহার এর ইমাম) সুফিয়ানে কেরাম আল্লাহ তায়ালার উপর অগাধ বিশ্বাস রাখে, ফেরেশতাদের, আল্লাহর কিতাবের, রাসুল গনের এবং আখিরাতের দিনের উপর বিশ্বাস রাখে। তারা তাদের কথায় কাজে রাসূল (সাঃ) ও সাহাবায়ে কেরাম এর অনুসরণ করেন। তারা সৎ কাজের আদেশ অসৎ কাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখে এবং আল্লাহর জিকির ও ইবাদতের জন্য লোকদের কে একত্রিত করে। অতএব তাদের কে গালি দেওয়া ও তাদের বিরুদ্ধে গীবত করা কোন অবস্থায় জায়েজ হবে না।

ইহা ছাড়া ভারতের “নদওয়াতুল উলামা” এর প্রধান শায়খ মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভী রহ. (রিজালুল ফিকরে ওয়াদ দাওয়া ফিল ইসলাম) পৃষ্ঠা নং ৩৪৯ এ সুফিদের সম্পর্কে নিম্নলিখিত আলোচনা করেছেন। পৃথিবীর যে সমস্ত এলাকায় মুসলমানদের অভিযান পরিচালিত হয়নি সে দূর দূরান্তের শহরগুলোতে ইসলামের প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে সুফিগনের অবদান অপরিসীম।

দক্ষিণ আফ্রিকা, ইন্দোনেশিয়া, ভারত মহাসাগরের দ্বীপ পুঞ্জ, চীন, হিন্দুস্তান সাইবেরিয়া ও উত্তর হিমায়ীত সাগরের দুই উপকূলীয় অঞ্চল সহ অনেক দেশে সুফি গণের কর্ম তত্পরতা ও তাদের দাওয়াতের মাধ্যমে ইসলাম প্রচারিত ও বিস্তৃতি লাভ করেছে।

সম-সাময়িক কালের অন্যতম সুফিয়ানে কেরাম ইসলামের প্রচার প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। তাঁরা হলেন

হজরত যুনাইদ বোগদাদী, ইমাম বিশর ইবনে হারেস মুহাসেবী আল হাফী, ইমাম গজ্জালী, মারুফ আল কারখী, জালালউদ্দীন রুমী, মহীউদ্দিন আব্দুল কাদের জীলানী, খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী, বাহাউদ্দিন নকশবন্দী, ইমাম রব্বানী মুজাদ্দিদে আলফ সানী রহ. প্রমুখ শীর্ষস্থানীয় সুফি গণের মাধ্যমেই পৃথিবীর অধিকাংশ এলাকায় ইসলামের সম্প্রসারণ ঘটেছে। এদের কে আল্লাহ পাক বেলায়তের নেয়ামতে ধন্য করেছেন। তাঁরা তাদের অনুসারীদের কে হক ও সত্যের পথে পরিচালিত করার জন্য প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকেন। তাদের অবদানের কারণে লক্ষ লক্ষ বনি আদম ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নিয়েছে। উল্লেখিত আলোচনা দ্বারা একথা সুস্পষ্ট ভাবে প্রমাণিত হয় যে, ইলমে তাসাউফ বা তরীকত চর্চা ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ অবিচ্ছেদ্য অংশ। এমতাবস্থায় যারা সুফিয়ানে কেরাম দের কে বেদাতী কাফের, ইত্যাদি ফতোয়া দেয়, গালি গালাজ করে তারা ভ্রষ্ট, পাপী, অন্যায়কারী। আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রহ, কুরআনুল কারিমের الصادقين শব্দের ব্যাখ্যায় বলেন

الصوفيون هم الصادقون في زمنهم فهم من أكمل صدقى زمانهم
والصديق في العصر الاول اكمل منهم
ولاجل ما وقع في كثير منهم من الاجتهاد والتنازع فيه تنازع الناس في
طريقهم الطائفة ذمت الصوفيون والتصوف وقالوا أنهم مبتدعون
خارجون عن السنة وطائفة غلت فيهم وادعوا أنهم افضل الخلق واكمل
بعد الأنبياء وكلما طرفي هذه الامر زميم والصواب انهم مجتهدون في
طاعة الله كما اجتهد غيرهم من أهل طاعة الله فيهم السابق المقرب
بحسب اجتهاده وفيهم المقتصد الذي هو من اصحاب اليمين (فتوى كبرى
لاين تيمية جلد ١، ص ١٨)

সুফীগনই হচ্ছেন সত্যবাদী এবং তারাই সমসাময়িক কালের পূর্ণ সিদ্ধিক। আর প্রথম যুগের সিদ্ধিকগন তাদের চাইতে আরও কামিল। তাদের ইজতিহাদের পদ্ধতির মধ্যে বিভিন্ন বিতর্ক রয়েছে। একদল সুফী এবং

তাসাউফকে অপবাদ দিয়ে থাকেন, তারা বলেন, সুফীগন বিদাতী সন্নাহ বিবর্জিত। আর একদল তাদের ব্যাপারে মাত্রাতিরিক্ত গুলুল করেন। তাদের দাবি তারা সৃষ্টির সেরা, নবীদের পরে যাদের স্থান। উক্ত দু দলই এবিষয়ে নিন্দনীয়।

সঠিক কথা হল তারা আল্লাহর আনুগত্যের মধ্যে মুজতাহিদ, যেভাবে অন্যরা ইজতিহাদ করেছে আল্লাহর অনুগত বান্দাদের মধ্যে। অতএব তাদের মধ্যে অনেকেই তাদের ইজতিহাদ অনুযায়ী অগ্রগামী রয়েছে এবং তাদের মধ্যে কেউ কেউ মধ্যম সারিতে রয়েছে, তারা আসহবুল যমীন বা ডান পন্থী।

এভাবে মুহাক্কিক ওলামায়ে কেরাম তাসাউফকে শরীয়তের মৌলিক বিষয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় আমি অল্পবিস্তর আলোচনা করলাম। আরও বিস্তারিত জানতে তাসাউফ সংক্রান্ত বিভিন্ন কিতাব অধ্যয়ন করতে হবে। যেমন, মকতুবাতে ইমাম রব্বানী, সিররুল আসরার, জামেউল উসুল, তাসাউফের আসল রূপ, এহয়াউ উলুমিদীন ইমাম গজ্জালি, কাশফুল মাহযুব আলহুজবীরি ইত্যাদি। তাসাউফের মধ্যে ৩ টি প্রাধান্য পায়।

এক - علم تصوف বা তরীকত সম্পর্কে যথাযথ ধারণা অর্জন করা এবং প্রাপ্ত জ্ঞান অনুযায়ী আমল করা। যাতে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সুস্পষ্ট ভাবে প্রতিভাত হয়।

দুই - সন্নাহ এর যথাযথ অনুসরণ এর মাধ্যমে বেশি বেশি নেক আমল করা। যা ইলমে তাসাউফ এর প্রধান উদ্দেশ্য এবং এ বিষয়ের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া অতীব প্রয়োজন।

তিন - কলেবর মধ্যে বিভিন্ন অবস্থার সৃষ্টি হওয়া। তবে এগুলো প্রকৃত উদ্দেশ্য নয়। উদ্দেশ্যের পরিপূরক হওয়ায় প্রশংসনীয়। কুতুবুল আলম মাওলানা রশিদ আহমাদ গংগুহী রহ. রচিত تذكرة الرشيد গ্রন্থে তাসাউফকে ৪টি স্তরে বিভক্ত করা হয়েছে যা নিম্ন রূপ-

১. علم صوفیه - তথা সুফিয়ানে কেরামের জ্ঞান, যা ইলমে জাহেরী হোক অথবা বাতেনী হোক। এর দ্বারা علم یقین বা দৃঢ় বিশ্বাস সৃষ্টি হয়। আর এ জ্ঞানই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ।

২. احوال صوفیه - অর্থাৎ আল্লাহ তালার সান্নিধ্য লাভের পথে সুফীদের মধ্যে যে সব অবস্থাদির সৃষ্টি হয় তাহার নাম احوال صوفیه - চরিত্র

সংশোধন এবং সার্বক্ষনিক আল্লাহর যিকির ও তরীকতের যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনা করার মাধ্যমে এ অবস্থার সৃষ্টি হয়ে থাকে।

৩. حقیقة التصوف:- অর্থাৎ তাসাউফের বাস্তবতা হল, আল্লাহর চরিত্রের সাথে সুশোভিত হওয়া, স্বীয় উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জনের জন্য পরিপূর্ণ ভাবে আত্মনিয়োগ করার মাধ্যমেই এর বাস্তবতা অর্জিত হয়।

ইলমে তাসাউফ এর উসূল বা মৌলিক বিষয়ঃ-

মুহাক্কিক ওলামায়ে কেরাম বলেন, ইলমে তাসাউফ এর জন্য ৫টি মৌলিক শর্ত রয়েছে।

১. বিনা প্রয়োজনে সাধারণ জনগণ সাথে দূরত্ব বজায় রাখা।

২. প্রকাশ্যে ও গোপনে তাকওয়া অবলম্বন করা।

৩. কথায় ও কাজে সুন্নতের অনুসরণ করা।

৪. কম- বেশি উভয় অবস্থায় আল্লাহর উপর সন্তুষ্ট থাকা।

৫. সহজ এবং কঠিন উভয় অবস্থায় আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করা।

আরোফে হিন্দ আকবর এলাহাবাদী বলেনঃ-

قرآن رہے پیش نظر یہ ہے شریعت

اللہ رہے پیش نظر یہ ہے طریقت

কোরআন থাকবে সদা সামনে ইহাই শরীয়ত

আল্লাহ থাকবে সদা সামনে ইহাই তরীকত।

সুতরাং আসুন আমরা ইলমে তাসাউফ বা তরীকত চর্চার মাধ্যমে আত্মাকে পরিশুদ্ধ করি, কলব থেকে ময়লা দূর করে

আল্লাহপাকে নৈকট্য লাভ করার চেষ্টা করি। আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে তাওফীক দান করুন, আমিন।

লেখক: সাবেক অধ্যক্ষ, চুনতী হাকিমিয়া কামিল মাদরাসা

লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।

ইলমে তাসাউফ বা তরীকত শিক্ষার গুরুত্ব

মুহাম্মদ হাফিজুল হক নিজামী

بسم الله الرحمن الرحيم

العلم التصوف : قال العلامة ابن عابدين التصوف هو علم يعرف به أنواع الفضائل وكيفية اكتسابها وأنواع الرزائل وكيفية أجتنا بها (رد المختار)

ইলমে তাসাউফ সম্পর্কে আল্লামা ইবনে আবেদীন বলেন, ইহা এমন জ্ঞান যার দ্বারা সৎগুণ সমূহের পরিচিতি লাভ করা যায় এবং উহা অর্জনের উপায় সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়।

ইলমে তাসাউফ অর্জন করার ব্যাপারে মুহাক্কিক ওলামায়ে কেরামের মতামতঃ-

قال محمد بن علي بن محمد بن عبد الرحمن الحصكفي الحنفى رح هو فرض عين وفرض كفاية مستحب (در المختار ص ১-৩১)

তিনি বলেন, যে পরিমাণ তাসাউফ শিক্ষার দ্বারা মানুষের চরিত্র বিশুদ্ধ ও মার্জিত হতে পারে ততটুকু ইলমে তাসাউফ শিক্ষা করা ফরজে আইন।

আর যে পরিমাণ তাসাউফ শিক্ষা করার দ্বারা অন্যকে ও তালিম দেওয়া যায়, সে পরিমাণ শিক্ষা অর্জন করা ফরজে কেফায়া।

আর যে পরিমাণ শিক্ষার ফলে ইলমে তাসাউফের অগাধ জ্ঞান লাভ করা যায় সে পরিমাণ জ্ঞান অর্জন করা মুবাহ।

وقال مجد الدين أبو السعد ابن الاثير الجزرى رح في 'جامع الاصول في احاديث الرسول'، و اعلم أن العلم الباطن الذي هو من أعظم المنجيات والسلوك والرياضيات والمجاهدات فرض عين على من لم يرزق قلبا سليما بالجزب الالهى (جامع الاصول، ص ২২৬)

আল্লামা ইবনুল আসীর যজরী রহঃ বলেন, যেনে রেখ, আধ্যাত্মিক জ্ঞান যাহা সর্বোত্তম মুক্তির পথ এবং রিয়াযত ও মুজাহেদার পথ ফরজে আইন, তার জন্য যে যজবে ইলাহী এর মাধ্যমে, কলবে সলিম, অর্জন করতে সক্ষম হয় নাই।

একটি সহীহ হাদিসের পর্যালোচনাঃ-

عن ابى سعيد الخدرى رض قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم، (جامع صغير لالسبوطى رقم ৫২৬৫، والطبراني في الأوسط رقم ৮৫৭৬، بيهقى فى شعب الإيمان رقم ১৬৬৭)

রাসুল স. এরশাদ করেন, জ্ঞান অর্জন করা ফরজ প্রত্যেক মুসলিম নর নারীর জন্য।

এ হাদিসের ব্যাখ্যায় মুহাদ্দেসীনে কেরামের মতামতঃ-

فعن الحسن البصري رضي الله عنه قال قال العلم علمان، علم قلب ولذلك العلم النافع وعلم على اللسان فذلك حجة الله عز وجل على ابن آدم (دارمى مرفقات ورواه ابن عبد البر باسناد صحيح عن الحسن مرسلًا وقد حسنه السيوطي في جامع صغير وقال المنذري إسناده صحيح

হযরত হাসন বসরি র. বলেন ইলম দুই প্রকার। একটি হল কলবের(তথা ইলমে বাতেন) অন্যটি জোবান দ্বারা পড়ে আয়ত্ত্ব করা জ্ঞান। যাহা বনি আদমের উপর আল্লাহর দলিল।

وقال صاحب الروح البيان العلامة اسماعيل حقي وصاحب السر الأسرار الشيخ محي الدين عبد القادر جيلاني،، ان يطلب الظاهر والباطن كلاهما فرض

আল্লামা ইসমাঈল হকী, ও শায়খ আবদুল কাদের জিলানি, উল্লেখিত দুটি হাদিস দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, জাহেরী ও বাতেনী উভয় প্রকার জ্ঞান অর্জন করা ফরজ।

وقال ملا علي قارئ رح معنى العلم المعرفة والشرعية ثم قال انه لا يتحقق شيء من علم الباطن إلا بعد التحقق بإصلاح الظاهر، كما أن علم الظاهر لا يتم إلا بإصلاح الباطن وكذا قال الإمام مالك رح من تفقه ولم يتصوف فقد تنفسق ومن تصوف ولم يتفقه فقد تذلق ومن جمع بينهما فقد تحقق (مرفاة ج ١)

মোল্লা আলী কারী রহ. বলেন, ইলমে বাতেন বা তাসাউফ শিক্ষা কখনো যথাযথ প্রতিষ্ঠিত হবেনা পরিশুদ্ধ ভাবে জাহেরী ইলম প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত। ঠিক তেমনি ভাবে জাহেরী ইলম(শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নের মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞান) পরিশুদ্ধ হবে না ইলমে বাতেন পরিশুদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত। তিনি বলেন, একথাটিই ইমাম মালেক রহ. নিম্নোক্ত বাক্যে বলেছেন,, যে ব্যক্তি কোরআন সুন্নাহর জ্ঞান অর্জন করেছে অথচ ইলমে তাসাউফ অর্জন করেনি সে ফাসিক। আর যে ব্যক্তি শুধু তাসাউফের জ্ঞান অর্জন করেছে কোরআন সুন্নাহর জ্ঞান অর্জন করনি সে জিন্দিক তথা নাস্তিক। আর যে উভয় জ্ঞানের মধ্যে সমন্বয় সাধন করেছে সে পরিশুদ্ধতা অর্জন করেছে।

وقال أبو طالب المكي رح هما علمان أصليان لا يتغنى أحدهما عن الآخر كالإسلام والإيمان مرطب على كل منهما بالآخر و كالجسم والقلب لا ينفك أحد أن صاحبه

হযরত আল্লামা আবু তালেব মক্কী রহ. বলেন, জাহেরী ও বাতেনী উভয়টি মূল জ্ঞান, একটি কে বাদ দিয়ে অন্যটি গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। যেমন ইসলাম ও ঈমান একটি অপরটির সাথে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত এবং যেমন শরীর আর অন্তর কোনটাই নিজের মালিক থেকে আলাদা নয়।

مظاہر حق، شرح مشکوٰۃ جلد ۱ باب الایمان میں ہے، اس چیز کو جاننا چاہئے کہ دین کی بنیاد اور اس کی تکمیل فقہ، عقائد، اور تصوف پر مبنی ہے

মিশকাত শরিফের ব্যাখ্যা,, মুজাহের হক,, কিতাবের ১ম খন্ডে বর্ণিত আছে যে, এ বিষয়টি জেনে রাখা দরকার যে, দ্বীনের ভিত্তি এবং উহার পরিপূর্ণতা ফিকাহ, আকায়দ, ও তাসাউফের উপর নির্ভরশীল।

حکیم الامۃ مولانا اشرف علی تھانوی فرماتے ہیں، بعض خشک عالم تصوف کو انکار کرتے ہے، یہاں انکو اچھی طرح سمجھائی جاتی ہے کہ تصوف حق ہے، تعلیم الدین، پراگت ج ۲،

উপ মহাদেশের গ্রান্ড মুফতি, হাকিমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থনবী রহ. বলেন কোন কোন অপরিপক্ষ আলেম তাসাউফ কে অস্বীকার করে। এখানে তাদের কে ভালভাবে বুঝিয়ে দেওয়া হচ্ছে যে তাসাউফ হক। তিনি আর এক জায়গায় বলেন,

علم تصوف جسکو شریعت میں تزکیہ نفس سے موسوم کرتے، وہ شریعت کی رو سے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہونا چاہئے، آجکل لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ علم تصوف حاصل کرنے کیلئے اہل عیال اور دوسرے دنیوی ضروریات کو چھوڑ دے اجتماعی معاملات بھی ترک کر دے، حالانکہ یہ سخت کذب ہے، اور یہ جاہل صوفیوں کا خیال ہے، جن لوگ تصوف کی حقیقت سے ناواقف ہے،، بشاعر حکیم الامت ص ۸۴

ইলমে তাসাউফ যাকে শরীয়তের ভাষায় তাজকিয়ায়ে নাফছ বা আত্মার পরিশুদ্ধি বলা হয়। উহা নবী স. এর সুন্নাহ অনুযায়ী হতে হবে। বর্তমানে লোকদের ধারণা যে, ইলমে তাসাউফ অর্জন করার জন্য পরিবার পরিজন ও দুনিয়ার যাবতীয় প্রয়োজন, সামাজিক মুআমলাত, মুআশরাত ছেড়ে দিয়ে

একাকিত্ব বরণ করতে হবে। ইহা সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং জাহেল সুফীদের ধারণা, যারা তাসাউফের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞ।

قال عمر بن عبد العزيز رض ان للایمان فرائض وشرايع وحدودا وسننا فمنستكملها استكمل الايمان ومن لم يستكملها لم يستكمل الايمان ،بخارى جلد ١

হযরত উমর ইবনে আব্দুল আজীজ বলেন, ঈমানের মধ্যে কতক ফরজ, শরীয়তের বিধিবিধান, হৃদুদ শাস্তির বিধান এবং কতিপয় সুনত সমুহ তথা যাবতীয় নফল, মুস্তাহাব ও মুবাহ রয়েছে। যে ব্যক্তি উক্ত সবগুলো পালন ও পরিপূর্ণ করবে সে ঈমান পূর্ণ করবে। আর যে ব্যক্তি তার সবগুলো পূর্ণ করবে না, সে ঈমান ও পূর্ণ করল না। বুখারি

এখানে নফল ইবাদত বলতে ইলমে তাসাউফ এর দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

وقال الإمام البخاري فاذا تراك شيئا من الكمال وهو ناقص بخارى ج ١ ص ١١

ইমাম বুখারি রহ. অধ্যয় রচনা করেছেনঃ তিনি বলেন, যখন কমাল বা পরিপূর্ণতা থেকে কোন একটা অংশ বাদ দেওয়া হয় তখন উহা নাকেস বা অপূর্ণ হয়ে যায়।

অতএব ইসলাম যেহেতু পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা, তাই সেখানথেকে যদি তাসাউফকে বাদ দেওয়া হয় তাহলে তা অপূর্ণ হয়ে যাবে।

فلهذا قال الشاه ولي الله محدث الدهلوى رح التصوف بالنسبة الى السائر الشريعة بمنزلة الروح والجسد وبمنزلة المعنى من اللفظ ،التفهيمات الالهيه ، ج ١ ص ١٢

এ জন্য উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস আল্লামা শাহ ওলিউল্লাহ দেহলভী রহ. বলেছেন, শরীয়তের যাবতীয় বিধানের মধ্যে তাসাউফের সম্পর্ক হল রূহ, এবং শরীরের মত, এবং বাক্যের মধ্যে শব্দ ও অর্থের মত অবিচ্ছেদ্য। হযরত ইমামো আজম আবু হানিফা রহ. ইলমে তাসাউফ কে ফিকাহ শাস্ত্রের পর্যায়েভুক্ত করেছেন। তিনি বলেছেন,

الفقه تصوية الباطن

অর্থাৎ ফিকাহ অন্তরাত্মাকে পরিপুঙ্ক করে। ইহা ছাড়া ও তাওজীহ নামক কিতাবের মর্মে জানা যায়,

وأبو حنيفة رحمه الله إنما لم يزيد عملا لأنه أراد الشمول أي أطلق الفقه على العلم بما لها وعليها سواء كان من الاعتقادات أو الوجدانيات أو

العمليات ثم سم الكلام فقها اكبر(شرح تلويح على التوضيح جلد ١ص ٢٤)

হযরত ইমাম আবু হনিফা রহ.ফিকহের সজ্জায় শুধু ইন্দিয়ঘটিত বাহ্যিক আমল কে সীমাবদ্ধ করেন নাই।যেহেতু তিনি আকায়েদ ও তাসাউফ কে ফিকহের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন।তিনি ফিকহের অর্থ লিখিয়াছেন,যাহা দ্বারা লাভ ও ক্ষতি পরিমাণ করা যায়,চাই উহা আকাঈদ,তাসাউফ কিংবা বাহ্যিক আমল বিষয়ক হউক।

কাজী ছনাউল্লাহ পানিপথী রহ.স্বীয় তাফসীর মাযহারীতে সূরা তাওবার ১২২নং আয়াতঃ

فلو لا نفر من كل فرقة طائفة ليتفوهوا فى الدين

আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন,

وأما العلم الدنى الذي يسمون أهل الصوفية الكرام فهو فرض العين لأن من ثمراتها تصفية القلب عن الا اشتغال بغير الله تعالى وا تصافه بدوام الحضور و تركية النفس عن الرزائل الأخلاق من العجب والكبر والحسد وحب الدنياوالكسل والاخلاص والطاعات وإيثار الشهوات والريالوالسمعة وغير ذلك،

যে সকল লোক ইলমে লদুনী বা ইলমে তাসাউফ লাভ করিয়াছেন,তাহারা সম্মানিত সুফি পদ বাচ্য হইয়া থাকেন। উহা শিক্ষা করা ফরজে আইন।যেহেতু উক্ত ইলম মনকে অন্যদিক হইতে খোদার লিপ্ত রাখে এবং খোদা তাআলাকে সর্বদা হাজের নাজের স্মরণ করাইয়া দেয়।এতদ্ব্যতিত নিম্নলিখিত মন্দ গুণ সমুহ যথা, ইবাদাতে গর্ব, অহংকার, হিংসা, দুনিয়া প্রীতি, অলসতা, মনখাটি নাহওয়া,ভোগ বিলাসী হওয়া,রিয়া সুখ্যাতির আখাংকা, প্রভৃতি যাবতীয় কু রিপু হইতে মনকে পবিত্র রাখে।পক্ষান্তরে আবার নিম্নলিখিত পবিত্র গুণগুলি যথা-তাওবা আল্লাহর ইচ্ছায় রাজী থাকা,নেয়ামতের শোকর,বিপদে ধৈর্য্যশীলতা প্রভৃতি গুণগুলি মনকে সুসজ্জিত করে।

হযরত ইমাম রব্বানী মুজাদ্দিদে আলফে সানী রহ. বলেন,হযরত রসুস মকবুল স.এর হাদিস,আলেমগণ নবীগনের ওয়ারিশ আশিয়া (আ.) যে ইলম পৃথিবীতে রেখেগেছেন উহা দুই ভাগে বিভক্ত। ১ম ইলমে শরিয়াহ, ২য় ইলমে আসরার বা তত্ত-জ্ঞান।যিনি এতদুভয় জ্ঞানের অধিকারী হয়েছেন তিনি প্রকৃত ওয়ারিসাতুল আশিয়া। আর যিনি মাত্র এক প্রকারের ইলমের অধিকারী হয়েছেন তিনি নবীদের যথার্থ ওয়ারিস নন।

ইহা ছাড়া কুরআনুল কারিমের আয়তঃ

يا أيها الذين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين

হে ঈমানদার লোকেরা আল্লাহ কে ভয় কর এবং সাদেকীনদের সোহবত গ্রহণ কর। এ আয়তের ব্যাখ্যায় হযরত হাসান বসরী রহ. বলেন

إن أردت أن تكون مع الصادقين فعليك بالزهد في الدنيا والكف عن أهل الملة (ابن كثير)

যদি তুমি সাদেকীনদের অন্তর্ভুক্ত হতে চাও তাহলে দুনিয়ার মোহ ত্যাগ করা তোমার জন্য কর্তব্য এবং সাধারণ জনগণের কাছ থেকে দূরে থাকা অর্থাৎ বিনা প্রয়োজনে মিলামিশা ত্যাগ করা। এখানে صادقین এর অর্থ তাসাউফ পন্থী ওলামা ও অউলিয়ায়ে কেরামদের বুঝানো হয়েছে।

وقال ابن جرير طبري رح، كونوا في الدنيا من أهل ولاية الله وطاعته تكونوا في الآخرة مع الصادقين في الجنة باتقياء الله

আল্লামা ইবনে জরীর তাবারী রহ. বলেন, তোমরা আল্লাহর দুনিয়াতে ওলীদের সাহচর্য্য গ্রহণ কর, তাহলে আখিরাতে সাদেকীন ও মুত্তাকীদের সাথে জান্নাতে যেতে পারবে।

قال الدكتور الشيخ محمد تنتوي رح الامام الازهر الشريف: الصوفيون هم يؤمنون بالله ورسله وملائكته وكتبه اليوم الآخر يتبعون في أقوالهم وأفعالهم الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويجتمعون للذكر وعبادة الله فلا يجوز ان غتبهم ويسبهم

আল্লামা ড. শায়খ আহমাদ তানতুবী রহ. (মিশরের আল আজহার এর ইমাম) সুফিয়ানে কেরাম, আল্লাহ তায়ালায় উপর অগাধ বিশ্বাস রাখে, ফেরেশতাদের, আল্লাহর কিতাবের, রাসুল গনের এবং আখিরাতে দিনের উপর বিশ্বাস রাখে। তারা তাদের কথায় কাজে রাসুলুল্লাহ (সাঃ) সাহাবায়ে কেরাম এর অনুসরণ করেন। তারা সৎ কাজের আদেশ অসৎ কাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখে এবং আল্লাহর জিকির ও ইবাদতের জন্য লোকদের কে একত্রিত করে। অতএব তাদের কে গালি দেওয়া ও তাদের বিরুদ্ধে গীবত করা কোন অবস্থায় জায়েজ হবে না।

ইহা ছাড়া ভারতের নদওয়াতুল উলামা এর প্রধান শায়খ মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভী রহ. রিজালুল ফিকরে ওয়াদ দাওয়া ফিল ইসলাম পৃষ্ঠা নং ৩৪৯ এ সুফিদের সম্পর্কে নিম্নলিখিত আলোচনা করেছেনঃ-

পৃথিবীর যে সমস্ত এলাকায় মুসলমানদের অভিযান পরিচালিত হয়নি সে দূর দূরান্তের শহরগুলোতে ইসলামের প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে সুফিগণের অবদান অপরিসীম।

দক্ষিণ আফ্রিকা, ইন্দোনেশিয়া, ভারত মহাসাগরের দ্বীপ পুঞ্জ, চীন, হিন্দুস্থান সাইবেরিয়া ও উত্তর হীমায়ীত সাগরের দুই উপকূলীয় অঞ্চল সহ অনেক দেশে সুফি গণের কর্ম তত্পরতা ও তাদের দাওয়াতের মাধ্যমে ইসলাম প্রচারিত ও বিস্তৃতি লাভ করেছে। সমসাময়িক কালের অন্যতম সুফিয়ানে কেরাম ইসলামের প্রচার প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। তাঁরা হলেনঃ-

হজরত যুনাইদ বোগদাদী, ইমাম বিশর ইবনে হারেস মুহাসেবী আল হাফী, ইমাম গজ্জালী, মারুফ আল কারখী, জালালউদ্দীন রুমী, মহীউদ্দিন আব্দুল কাদের জীলানী, খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী, বাহাউদ্দিন নকশবন্দী, ইমাম রব্বানী মুজাদ্দিদে আলফ সানী রহ. প্রমুখ শীর্ষস্থানীয় সুফি গণের মাধ্যমেই পৃথিবীর অধিকাংশ এলাকায় ইসলামের সম্প্রসারণ ঘটেছে। এদের কে আল্লাহ পাক বেলায়তের নেয়ামতে ধন্য করেছেন। তাঁরা তাদের অনুসারীদের কে হক ও সত্যের পথে পরিচালিত করার জন্য প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকেন। তাদের অবদানের কারণে লক্ষ লক্ষ বনি আদম ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নিয়েছে।

উল্লেখিত আলোচনা দ্বারা একথা সুস্পষ্ট ভাবে প্রমাণিত হয় যে, ইলমে তাসাউফ বা তরীকত চর্চা ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ অবিচ্ছেদ্য অংশ। এমতাবস্থায় যারা সুফীয়ানে কেরাম দের কে বেদাতী কাফের, ইত্যাদি ফতোয়া দেয়, গালি গালাজ করে তারা ভ্রষ্ট, পাপী, অন্যায়কারী।

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রহ, কুরআনুল কারিমের الصادقين শব্দের ব্যাখ্যায় বলেন

الصوفيون هم الصادقون في زمنهم فهم من أكمل صدق زمانهم والصدق في العصر الاول اكمل منهم ولاجل ما وقع في كثير منهم من الاجتهاد والتنازع فيه تنازع الناس في طريقهم الطائفة ذمت الصوفيون والتصوف وقالوا أنهم مبتدعون خارجون عن السنة وطائفة غلت فيهم وادعوا أنهم افضل الخلق واكمل بعد الأنبياء وكلا طرفي هذه الامر مذموم والصواب انهم مجتهدون في طاعة الله كما اجتهد غيرهم من أهل طاعة الله فيهم السابق المقرب بحسب اجتهاده وفيهم المقتصد الذي هو من اصحاب اليمين (فتاوى كبرى لابن تيمية جلد ۱۱ ص ۱۸)

সুফীগনই হচ্ছেন সত্যবাদী,এবং তারাই সমসাময়িক কালের পূর্ণ সিদ্ধিক। আর প্রথম যুগের সিদ্ধিকগন তাদের চাইতে আরও কামিল।

তাদের ইজতিহদের পদ্ধতির মধ্যে বিভিন্ন বিতর্ক রয়েছে। একদল সুফী এবং তাসাউফকে অপবাদ দিয়ে থাকেন, তারা বলেন, সুফীগন বিদাতী সন্নাহ বিবর্জিত। আর একদল তাদের ব্যাপারে মাত্রাতিরিক্ত গুলুল করেন। তাদের দাবি তারা সৃষ্টির সেরা, নবীদের পরে যাদের স্থান উক্ত দু দলই এবিষয়ে নিন্দনীয়।

সঠিক কথা হলঃ তারা আল্লাহর আনুগত্যের মধ্যে মুজতাহিদ, যেভাবে অন্যরা ইজতিহাদ করেছে আল্লাহর অনুগত বান্দাদের মধ্যে। অতএব তাদের মধ্যে অনেকেই তাদের ইজতিহাদ অনুযায়ী অগ্রগামী রয়েছে এবং তাদের মধ্যে কেউ কেউ মধ্যম সারিতে রয়েছে, তারা আসহবুল যমীন বা ডান পন্থী।

এভাবে মুহাক্কিক ওলামায়ে কেরাম তাসাউফকে শরীয়তের মৌলিক বিষয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় আমি অল্পবিস্তর আলোচনা করলাম। আরও বিস্তারিত জানতে তাসাউফ সংক্রান্ত বিভিন্ন কিতাব অধ্যয়ন করতে হবে। যেমন, মকতুবাতে ইমাম রব্বানী, সিররুল আসরার, জামেউল উসুল, তাসাউফের আসল রূপ, এহয়াউ উলুমিদ্দীন ইমাম গজ্জালি, কাশফুল মাহযুব আলহজবীরি ইত্যাদি।

তাসাউফের মধ্যে ৩ টি প্রাধান্য পায়।

একঃ- علم تصوف বা তরীকত সম্পর্কে যথাযথ ধারণা অর্জন করা এবং প্রাপ্ত জ্ঞান অনুযায়ী আমল করা। যাতে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সুস্পষ্ট ভাবে প্রতিভাত হয়।

দুইঃ- সন্নাহ এর যথাযথ অনুসরণ এর মাধ্যমে বেশি বেশি নেক আমল করা। যা ইলমে তাসাউফ এর প্রধান উদ্দেশ্য এবং

এ বিষয়ের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া অতীব প্রয়োজন।

তিনঃ- কলেবর মধ্যে বিভিন্ন অবস্থার সৃষ্টি হওয়া। তবে এগুলো প্রকৃত উদ্দেশ্য নয়। উদ্দেশ্যের পরিপূরক হওয়ায় প্রশংসনীয়।

কুতুবুল আলম মাওলানা রশিদ আহমাদ গংগুহী রহ. রচিত تذكرة الرشيد এছাে তাসাউফকে ৪টি স্তরে বিভক্ত করা হয়েছে

যা নিম্ন রূপঃ-

১. علم صوفيه:-তথা সুফিয়ানে কেরামের জ্ঞান,যা ইলমে জাহেরী হোক অথবা বাতেনী হোক।এর দ্বারা علم يقين বা দৃঢ় বিশ্বাস সৃষ্টি হয়।আর এ জ্ঞানই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ।

২. احوال صوفيه:-অর্থাৎ আল্লাহ তালার সান্নিধ্য লাভের পথে সুফীদের মধ্যে যে সব অবস্থাদির সৃষ্টি হয় তাহার নাম صوفيه-চরিত্র সংশোধন এবং সার্বক্ষনিক আল্লাহর যিকির ও তরীকতের যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনা করার মাধ্যমে এ অবস্থার সৃষ্টি হয়ে থাকে।

৩. حقيقة التصوف:-অর্থাৎ তাসাউফের বাস্তবতা হল,আল্লাহর চরিত্রের সাথে সুশোভিত হওয়া, স্বীয় উদ্যোগ ও লক্ষ্য অর্জনের জন্য পরিপূর্ণ ভাবে আত্মনিয়োগ করার মাধ্যমেই এর বাস্তবতা অর্জিত হয়।

ইলমে তাসাউফ এর উসূল বা মৌলিক বিষয়ঃ-

মুহাক্কিক ওলামায়ে কেরাম বলেন,ইলমে তাসাউফ এর জন্য ৫টি মৌলিক শর্ত রয়েছে।

১.বিনা প্রয়োজনে সাধারণ জনগণ সাথে দূরত্ব বজায় রাখা।

২.প্রকাশ্যে ও গোপনে তাকওয়া অবলম্বন করা।

৩.কথায় ও কাজে সুন্নতের অনুসরণ করা।

৪.কম- বেশি উভয় অবস্থায় আল্লাহর উপর সম্বৃষ্ট থাকা।

৫.সহজ এবং কঠিন উভয় অবস্থায় আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করা।

আরোফে হিন্দ আকবর এলাহাবাদী বলেনঃ-

قرآن رہے پیش نظر یہ ہے شریعت
اللہ رہے پیش نظر یہ ہے طریقت

কোরআন থাকবে সদা সামনে ইহাই শরীয়ত

আল্লাহ থাকবে সদা সামনে ইহাই তরীকত।

সুতরাং আসুন আমরা ইলমে তাসাউফ বা তরীকত চর্চার মাধ্যমে আত্মাকে পরিশুদ্ধ করি,কলব থেকে ময়লা দূর করে

আল্লাহপাকে নৈকট্য লাভ করার চেষ্টা করি।আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে তাওফীক দান করুন, আমিন।

সাবেক অধ্যক্ষ

চুনতী হাকিমিয়া কামিল মাদরাসা

লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।

ফতোয়া প্রদানের নীতিমালা ও শর্তাবলী

আবু মুসা মুহাম্মদ খালেদ জমীল

'ইফতা' (الإفتاء) তথা ফতোয়া প্রদান ইসলামী শরিয়াহর একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে তাদের অজ্ঞাত বিষয়ে বিজ্ঞদের কাছে প্রশ্ন করার তথা ফতোয়া চাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন : فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ "সুতরাং তোমরা জ্ঞানীদের জিজ্ঞাসা কর, যদি তোমরা না জেনে থাক" [সূরা নাহল-৪৩, সূরা আশ্শিয়া -০৭]। মুফাসিসরদের ভাষ্য অনুযায়ী এখানে 'আহলু যিকির' দ্বারা ঐ সমস্ত লোকদের বুঝানো হয়েছে, যাদের দিকে 'ইলম' কে সম্পৃক্ত করা হয় তথা 'আহলে ইলম'। অনুরূপভাবে এই সমস্ত 'আহলে ইলম' এর উপর প্রশ্ন কারীদের প্রশ্নের উত্তর দেয়া এবং আল্লাহ প্রদত্ত ইলমকে গোপন না করাটা ফরয করা হয়েছে। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন:

"إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَسْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ" .

"নিশ্চয় যারা সেসব বিষয় গোপন করে, যা আল্লাহ কিতাবে নাখিল করেছেন এবং সেগুলোর বিনিময়ে অল্প মূল্য গ্রহণ করে, তারা মূলত নিজেদের পেটে আগুন ছাড়া আর কিছুই খায় না। আর আল্লাহ কেয়ামতের দিন তাদের সাথে কথা বলবেন না, তাদের পবিত্র করবেন না, আর তাদের জন্যে রয়েছে বেদনাদায়ক আযাব। [সূরা বাকারাহ: ১৭৪]। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন :

من سئل عن علم يعلمه فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار .

" যাকে এমন কোন 'ইলম' তথা জ্ঞাতব্য বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয় ; যা সে জানে, অতঃপর সে তা গোপন করে, তাকে কিয়ামতের দিন আগুনের লাগাম পরানো হবে।" [ইবনু মা-জাহ, আবু হুরাইরাহ (রাঃ) বর্ণিত]।

■ ফাতোয়া এর পরিচয়:

আল ফাতওয়া (الفُتْوى) , আল ফুত্যা (الفُتْيَا) শব্দ দুটি আল ইফতা (الإفتاء) ত্রিণ্যমূল হতে সৃষ্ট দুটি ইসম বা বিশেষ্য। শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো: কোন বিষয়কে স্পষ্ট করা এবং এর জটিলতা বিদূরিত করা, চাই বিষয়টি শরীয়তের বিধিবিধানের সাথে সম্পৃক্ত হোক বা

মানুষ আপনার নিকট ফতোয়া জানতে চায়। অতএব, আপনি বলে দিন, আল্লাহ তোমাদিগকে কালালাহ এর মীরাস সংক্রান্ত সুস্পষ্ট নির্দেশ বাতলে দিচ্ছেন।

নিঃসন্দেহে পবিত্র কুরআন মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর বান্দাদের জন্য এক বিশাল ফতোয়া সমগ্র তথা তাদের সব সমস্যার সুস্পষ্ট সমাধান। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন:

. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَنُذْرًا لِّلْمُؤْمِنِينَ
"আমি আপনার প্রতি নাযিল করেছি আল কিতাব তথা কুরআন; প্রত্যেক বস্তুর সুস্পষ্ট বর্ণনা, হেদায়ত, রহমত ও মুসলমানদের জন্যে সুসংবাদ হিসেবে" [সূরা নাহল: ৮৯]।

ইসলামের গৌরবময় ইতিহাসে সর্বকালের সর্বপ্রথম ইফতা বা ফতোয়া প্রদানের দায়িত্ব পালনকারী হলেন নবীকুল শিরোমণি,শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তিনি মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত তাঁর সুস্পষ্ট ওহির মাধ্যমে সাহাবীদের বিভিন্ন প্রশ্নের সমাধান ও ধর্মীয় বিধান সম্বলিত ফতোয়া প্রদান করতেন। তাঁর ফতোয়া সমগ্র ছিল শরয়ী বিধি-বিধানের এক বিশাল সমষ্টি এবং কুরআনের পর ইসলামী শরিয়াহর দ্বিতীয় সর্ববৃহৎ উৎস।

নবীজীর পর ফতোয়া প্রদানের গুরু দায়িত্ব পালন করেন সাহাবায়ে কেরাম। আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম রাহঃ তাঁর إعلام الموقعين عن رب العالمين গ্রন্থে উল্লেখ করেন :

"والذين خُفِظَتْ عنهم الفتوى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مئة وثيِّف وثلاثون نفساً، ما بين رجل وامرأة، وكان المكثرون منهم سبعة : عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود، وعائشة أم المؤمنين، وزيد بن ثابت، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر." (رضى الله تعالى عنهم)

"রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাহাবীদের মধ্যে যাদের ফতোয়া সংরক্ষিত রয়েছে তাদের সংখ্যা নারী পুরুষ মিলে একশত ত্রিশ জনের অধিক। তাঁদের মধ্যে ফতোয়া প্রদানে সর্বাধিক সাতজন হলেন : হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব,আলী ইবনু আবি তালিব, আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ, উম্মুল মুমেনীন আয়েশা, যাক্কদ বিন সাবিত, আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস,আব্দুল্লাহ ইবনু উমার রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুম"।

সাহায্যে কেরামের পর মুমিনদের ফতোয়ার উৎস ও কেন্দ্রস্থল ছিলেন তাবেয়িন কেরাম, যারা মুসলমানদের কর্তৃক বিজিত বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়েছিলেন। অতঃপর চার ইমাম ও অপরাপর মুজাহিদ ইমামগণ মুসলিম উম্মাহকে ফতোয়া দানের গুরু দায়িত্ব পালন করেন। সর্বোপরি তারা সংকলন করেন 'ফিকহ শাস্ত্র', যা হলো মুসলিম উম্মাহর জন্য ইসলামের যাবতীয় বিধিবিধান পালনের ক্ষেত্রে 'রেডিমেড ফতোয়া'।

ফতোয়া প্রদানের গুরুত্ব ও মর্যাদার ব্যাপারে ইমাম নববী রহঃ এর এই উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য :

"اعلم أن الإفتاء عظيم الخطر، كبير الموقع، كثير الفضل لأن المفتي وارث الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم وقائم بفرض الكفاية لكنه معرض للخطأ".

"জেনে রাখ 'ইফতা' তথা ফতোয়া প্রদান অতি বিপদজনক কাজ, বিশাল গুরুত্বপূর্ণ ও মর্যাদাপূর্ণ দায়িত্ব কারণ মুফতি হলেন নবীদের ওয়ারিশ, উম্মতের ফরজে কেফায়াহ'র দায়িত্ব পালনকারী। তবে তিনি ঝুঁকির মধ্যে থাকেন।" [المجموع شرح المذهب/ باب آداب الفتوى والمفتي]

■ ফতোয়া প্রদানের শর্তাবলী:

ফতোয়া প্রদান ইসলামের একটি গুরু দায়িত্ব। ইসলাম যে কাউকে ফতোয়া প্রদানের অনুমতি দেয় না। ইসলামের দৃষ্টিতে এর জন্য যোগ্যতা অর্জন করা এবং কতিপয় সুনির্দিষ্ট শর্তে উত্তীর্ণ হওয়া আবশ্যিক। সেই শর্তগুলো নিম্নরূপ:

১. ইসলাম তথা মুসলমান হওয়া যেহেতু মুফতি আল্লাহর বিধান বর্ণনা করেন এবং রাসূলুল্লাহর প্রতিনিধিত্ব করেন সেহেতু অমুসলিম ব্যক্তির জন্য ফতোয়া প্রদান করা বৈধ নয়।

২. তাকলীফ তথা শরীয়তের বিধান পালনের যোগ্য বয়ঃপ্রাপ্ত ও বিবেক-বুদ্ধির অধিকারী হওয়া।

৩. আদালত তথা তাকওয়া ও মানবিকতার অধিকারী হওয়া।

৪. ইলম তথা ফতোয়া সংশ্লিষ্ট সব জ্ঞানের অধিকারী হওয়া, যেমন:

ক. আরবি ভাষার সাথে সম্পর্কিত সব জ্ঞান,

খ. আল কোরআন ও উলুমুল কুরআন সম্পর্কিত সব জ্ঞান,

- গ. আল হাদিস ও উসুলুল হাদীস সম্পর্কিত সব জ্ঞান,
 ঘ.আল কালাম বা আকাঈদ শাস্ত্র এবং
 ঙ. আল ফিকহ ও উসুলুল ফিকহ।
 ৫. ইসলামী আইন ও বিধান নিয়ে চিন্তা গবেষণা করার যোগ্যতা অর্জন করা।
 ৬. সমাজ জীবন সম্পর্কে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করা।
 ৭. সুবিজ্ঞ শিক্ষকদের নিকট থেকে ফিকহ শাস্ত্রের শিক্ষা অর্জন করা এবং তাদের নিকট থেকে একাডেমিক সনদ ও স্বীকৃতি লাভ করা।
 ৮. ফিকহী প্রতিভার অধিকারী হওয়া। ফতোয়া প্রদানের জন্য শুধুমাত্র সুবিজ্ঞ শিক্ষকদের নিকট থেকে ফিকহ শাস্ত্রের শিক্ষা ও সনদ অর্জন করা যথেষ্ট নয় বরং নিম্ন বর্ণিত ফেকহী প্রতিভার অধিকারী হতে হবে:
 ক. ইসলামী আইন ও বিধানের মূলনীতি জানা,
 খ. ইসলামী আইন ও বিধানের সূত্র সমূহ জানা,
 গ. ইসলামী আইন ও বিধানের অন্তর্নিহিত কারণ ও তাৎপর্য সমূহ জানা এবং
 ঘ. নির্ভরযোগ্য ও অনির্ভরযোগ্য কিতাব সমূহের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করতে জানা।
 ৯. নিজের ইফতা সম্পর্কিত যোগ্যতার ক্ষেত্রে আত্মবিশ্বাসের অধিকারী হওয়া।
 ১০. নিজের ইফতা সম্পর্কিত যোগ্যতার ব্যাপারে বিজ্ঞ লোকদের স্বীকৃতি অর্জন করা।

■ ফতোয়া প্রদানের নিয়মনীতি :

আধুনিক বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইসলামী চিন্তাবিদ আল্লামা তক্বী ওসমানী তাঁর **اصول الافتاء** গ্রন্থে ফতোয়া প্রদানের নিয়মনীতিকে দুই ভাগে ভাগ করেছেন:

- ক. ব্যক্তিগত পর্যায়ে মুফতির নীতি - আদর্শ,
 খ. ফতোয়া দানের সময় মুফতির অবলম্বনীয় নিয়মনীতি।

✍ ব্যক্তিগত পর্যায়ে মুফতির নীতি - আদর্শ হবে নিম্নরূপ:

১. সুন্দর বেশভূষা অবলম্বন করা বিশেষ করে সুন্দর পোশাক পরিচ্ছদ পরিধান করা, শরীয়তের নির্দেশনা অনুযায়ী পবিত্রতা, পরিচ্ছন্নতা অবলম্বন

করা, লজ্জা স্থান আবৃত করা, নিষিদ্ধ রেশমী কাপড়, স্বর্ণালঙ্কার ও কাফিরদের লোগো/ প্রতীক বর্জন করা।

২. সুন্দর চলা-চরিত্র অবলম্বন করা বিশেষ করে শরীয়তের নির্দেশনা অনুযায়ী আমল করা, শরীয়তের মাপকাঠিতে জিহ্বা নিয়ন্ত্রণ করা এবং আমলের ক্ষেত্রে মধ্যম মানের হওয়ার পরিবর্তে উচ্চ মানের হওয়া।

৩. নিয়তের বিশুদ্ধতা অর্থাৎ মুফতি নিয়ত করবেন রাসুলুল্লাহর প্রতিনিধিত্ব করার, মানুষের কাছে সত্যের প্রকাশ করা ও সত্য গোপন না করার ব্যাপারে আল্লাহর অঙ্গীকার পূরণ করার, আল্লাহর কিতাব ও তাঁর নবীর সুন্নাহ অনুযায়ী আমল জীবন্ত রাখার, আল্লাহর বিধান অনুযায়ী উম্মতের অবস্থার সংশোধন করার এবং প্রশংসা, সুনাম, সুখ্যাতি লাভের ইচ্ছা ছাড়া প্রতিটি কাজে আল্লাহর সম্বৃদ্ধি অর্জন করার।

৪. বাস্তব জীবনে নিজের ফতোয়া অনুযায়ী আমল করা।

৫. الشبهات তথা সন্দেহ যুক্ত বিষয় উপর আমল করা থেকে বিরত থাকা। সাধারণ মানুষের জন্য যে ভালো কাজের বাধ্যবাধকতা নেই তা নিজের জন্য বাধ্য করে নেয়া।

৬. রাগ, ভয়, অতি টেনশন ও অতি আনন্দ, ক্ষুধা, কঠিন রোগ, অসহ্য গরম, তীব্র শীত, পেশাব পায়খানার প্রচণ্ড বেগ - ইত্যাদি প্রতিকূল অবস্থায় ফতোয়া প্রদানে বিরত থাকা।

৭. যাবতীয় নফল ইবাদতে অগ্রগামী হওয়া।

৮. ফেকহী গবেষণা ও অধিকতর ইলম অর্জনে উদগ্রীব থাকা।

৯. বেশি করে আল্লাহর যিকিরে নিমগ্ন থাকা।

১০. ফতোয়া প্রদানের আগে সঠিক সমাধান প্রদানের ব্যাপারে আল্লাহর তৌফিক কামনা করা।

✍ ফতোয়া প্রদানের সময় মুফতির অবলম্বনীয় নীতিমালা হলো :

১. ফতোয়া প্রদানের বিনিময়ে কোন পারিশ্রমিক না চাওয়া। আল্লামা ইবনু আবেদীন রহঃ বলেন: মৌখিক ফতোয়া দানের বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ বৈধ নয়। লিখিত ফতোয়া প্রদানের বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ বৈধ, তবে বিরত থাকাটাই উত্তম। পারিশ্রমিকও কাজের অনুপাতে হতে হবে।

২. কোন মজলিসে অধিকতর জ্ঞানী থাকলে তাঁর সামনে আগেভাগে ফতোয়া প্রদান করা অনুচিত। বরং উত্থাপিত প্রশ্নটা তাঁর কাছেই অর্পণ করা উচিত। তবে তাঁর অনুমতি সাপেক্ষে ফতোয়া প্রদান করা যাবে।

৩. প্রশ্নকারীর প্রশ্ন গভীরভাবে অনুধাবন করা এবং ভেবে দেখা যে, তা উত্তর দেয়ার উপযুক্ত কি না? কারণ অনেক সময় ফিতনা সৃষ্টি অথবা অহেতুক বিতর্ক সৃষ্টির জন্য প্রশ্ন করা হয়।

৪. উত্থাপিত প্রশ্নকে যাবতীয় শর্ত ও অংশ সহকারে খুঁজে নেয়া। অনেক সময় প্রশ্ন অসম্পূর্ণ হয়, যাতে প্রশ্নকারী কোন শর্ত বাদ দিয়ে দেয়। যার ফলে বিধান পরিবর্তিত হয়।

৫. উত্তর বা ফতোয়ার সঠিকতার ব্যাপারে নিশ্চিত হয়েই ফতোয়া প্রদান করা। উত্তরের সঠিকতার ব্যাপারে সামান্যতম পরিমাণ সন্দেহ থাকলে ফতোয়া দেয়া যাবে না। ফতোয়া প্রদানে প্রশ্নকারীর পিড়াপিড়িতে তাড়াহুড়া করে উত্তর দানে প্রভাবিত হওয়া যাবে না।

৬. প্রশ্নের উত্তর সহজ ভাষায় লেখা, যাতে প্রত্যেক আলেম ও সাধারণ মানুষ উহার মর্ম বুঝতে পারে।

৭. প্রশ্ন যদি দ্বীনের মূলনীতি অথবা শরীয়তের অকাট্য বিষয় সম্পর্কিত হয় তাহলে ফিকহ এর কিতাব থেকে নয় বরং কুরআন ও হাদীসের দলিল পেশ করা উচিত, তবে প্রশ্ন দ্বীনের শাখা মূলক বিষয় সম্পর্কিত হলে ফিকহ এর কিতাব থেকে দলিল পেশ করা যাবে।

৮. ফতোয়ার ভাষা এত ছোট হবে না যা মর্ম উপলব্ধিতে বিঘ্ন সৃষ্টি করে অথবা এমন দীর্ঘ হবে না যা বিরক্তির উদ্বেক করে।

৯. ফতোয়া ও এর ভাষা শরয়ী বিধান, শরয়ী দলিল, ফেকহী দলিল এর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। আবেগ প্রবণতা, প্রশংসা, রাগ-বিরাগ থেকে ফতোয়া মুক্ত থাকবে।

১০. মুফতির জন্য উচিত হবে যথাসম্ভব প্রশ্নকারীর দুর্ব্যবহারে ধৈর্য ধারণ করা।

ফতোয়া লিখনের নিয়ম :

১. লেখা সুন্দর হওয়া, কারণ সুন্দর লেখা অর্থ ও উদ্দেশ্য বুঝার ক্ষেত্রে সহায়ক হয়।

২. প্রশ্নের একই পৃষ্ঠায় উত্তর তথা ফতোয়া লিপিবদ্ধ করা।

৩. বিসমিল্লাহ, আল্লাহর প্রশংসা ও রাসুলুল্লাহর প্রতি দরুদ পাঠ করে ফতোয়া লিপিবদ্ধ করা।

৪. ফেকহী প্রশ্নের ক্ষেত্রে উত্তর লিপিবদ্ধ করার পর **والله اعلم** এবং আকাঈদ ও দ্বীনের মূলনীতি সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর লিপিবদ্ধ করার পর **والله الموفق** লেখা।

৫. উত্তরে অর্থ এলোমেলো হাওয়া থেকে বাঁচতে বিরাম চিহ্নের যথাযথ ব্যবহার করা।

৬. ফতোয়া শেষে স্বাক্ষর ও তারিখ লেখা।

উপসংহার:

ফতোয়া প্রদান যোগ্য আলেমদের জন্য মহান আল্লাহ প্রদত্ত অধিকার। তদুপরি এটি হচ্ছে তাদের জন্য রাসুলুল্লাহর উত্তরাধিকার। দুনিয়ার কোন শক্তি আলেমদের এই অধিকার ও উত্তরাধিকার কেড়ে নিতে পারে না। এখানে উল্লেখ্য যে, ২০০১ সালের ১ জানুয়ারি বাংলাদেশের হাইকোর্টের একটি বেঞ্চ সব ধরনের ফতোয়া প্রদান অবৈধ ঘোষণা করে রায় প্রদান করে। ২০০১ সালেই এই রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগে দু'জন মুসলিম ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব এই মর্মে আপীল দায়ের করেন যে, "ফতোয়া অবৈধ হতে পারে না। ফতোয়া ইসলামী জীবন বিধানের একটি বৈধ পন্থা। ফতোয়া দেওয়া এক জিনিস আর ফতোয়ার মাধ্যমে শাস্তি দেওয়া আরেক জিনিস। এ দুটি বিষয়কে আলাদা করে দেখলে আর সমস্যা হয় না"। দীর্ঘ ১০ বছর পর ২০১১ সালের ১ মার্চ আপিল বিভাগে এই আপিল মামলার শুনানি শুরু হয়। ২০১১ সালের ১২ মে আপিল বিভাগ সংক্ষিপ্ত রায় এবং পরবর্তীতে ২০১৫ সালের জানুয়ারি মাসে ১৩৮ পৃষ্ঠার পূর্ণাঙ্গ রায় প্রকাশ করে। রায়ে জানানো হয় "ধর্মীয় বিষয়ে ফতোয়া দেওয়া যাবে এবং শিক্ষিত লোকেরাই শুধু ফতোয়া দিতে পারবেন এবং গ্রহণের বিষয়টি হতে হবে স্বতস্কূর্ত, কারো উপর কোনো শাস্তি প্রয়োগ করা যাবে না"।

লেখক : অধ্যক্ষ, আধুনগর ইসলামিয়া কামিল মাদ্রাসা

২০২৪ সালের পহেলা অক্টোবর ৫৪ তম মাহফিলে সীরাতুননবী (ﷺ) এর সপ্তদশ দিবসের আলোচনা।

জাতিগত সম্প্রীতি রক্ষায় ইসলামের অবদান হাফেজ মাওলানা আব্দুল মান্নান শামসী

মানবসভ্যতার ইতিহাসে যখনই মানুষ বর্ণবাদ, জাতিগত অহংকার, ভৌগোলিক সংকীর্ণতা, ভাষাগত বৈষম্য এবং কৃত্রিম আভিজাত্যের মোহে আবদ্ধ হয়ে বিভেদ ও সংঘাতের পথে ধাবিত হয়েছে, তখনই শান্তি, সাম্য, ভ্রাতৃত্ব ও মানবিক মর্যাদার এক মহান বার্তা নিয়ে ইসলামের আবির্ভাব ঘটেছে। ইসলাম কেবল একটি ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান বা নির্দিষ্ট কিছু ইবাদতের সমষ্টি নয়; বরং এটি একটি পূর্ণাঙ্গ ও সার্বজনীন জীবনব্যবস্থা, যা সমগ্র মানবজাতিকে ন্যায়, ভালোবাসা, পারস্পরিক সম্মান ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার শিক্ষা দেয়।

‘ইসলাম’ শব্দের অর্থ হলো শান্তি, নিরাপত্তা ও আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আনুগত্য। এই শান্তির মূল ভিত্তি হলো ন্যায়বিচার, মানবিক মর্যাদা, পারস্পরিক শ্রদ্ধা এবং জাতিগত সম্প্রীতি। ইসলাম মানুষকে শিক্ষা দিয়েছে যে, মানুষের প্রকৃত মর্যাদা কোনো বংশ, গোত্র, ভাষা, বর্ণ, দেশ বা সম্পদের কারণে নির্ধারিত হয় না; বরং মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব নির্ভর করে তার তাকওয়া, নৈতিকতা ও উত্তম চরিত্রের উপর।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নবুওয়াত লাভের পূর্বে বিশ্বের সামাজিক অবস্থা ছিল অত্যন্ত সংকটপূর্ণ। বিশেষ করে আরব সমাজে গোত্রীয় অহংকার, বংশমর্যাদার গর্ব এবং দুর্বলদের প্রতি অবহেলা ছিল ব্যাপক। মানুষ নিজ নিজ গোত্র ও বংশকে শ্রেষ্ঠ মনে করত এবং সামান্য বিষয় নিয়েও দীর্ঘস্থায়ী সংঘাত ও রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে লিপ্ত হতো। এই জাহেলি সমাজব্যবস্থায় মানবতার পরিবর্তে প্রাধান্য পেয়েছিল বর্ণ ও গোত্রের অহংকার।

ইসলাম এসে এই কৃত্রিম বৈষম্যের সকল প্রাচীর ভেঙে দেয়। পবিত্র কুরআন ঘোষণা করেছে যে, সকল মানুষ একই উৎস থেকে সৃষ্টি। তারা সবাই এক পিতা আদম (আ.) ও এক মাতা হাওয়া (আ.)-এর সন্তান। তাই কোনো মানুষ জন্মগতভাবে অন্য মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ নয়। আল্লাহ তাআলা বলেন, হে মানবজাতি! আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা পরস্পর পরিচিত হতে পারো। নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি অধিক মর্যাদাসম্পন্ন, যে অধিক তাকওয়াবান। (সূরা আল-হুজুরাত: ১৩)

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর জীবন, কর্ম ও বিদায় হজের ভাষণের মাধ্যমে জাতিগত সাম্যের এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। তিনি আরব-অনারব, ধনী-দরিদ্র, সাদা-কালো সকল মানুষের সমান মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাঁর সাহচর্যে হযরত বিলাল (রা.), সালমান ফারসি (রা.) ও সুহাইব রুমি (রা.)-এর মতো বিভিন্ন জাতি ও বর্ণের মানুষ সম্মানিত স্থান লাভ করেন। এর মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, ইসলাম মানবজাতির মধ্যে বিভেদ নয়; বরং ঐক্য, সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার ধর্ম।

জাতিগত সম্প্রীতি রক্ষায় ইসলামের এই ঐতিহাসিক ও অনন্য অবদান মানবসমাজের জন্য চিরন্তন শিক্ষা বহন করে। ইসলাম কীভাবে বর্ণবাদ ও বৈষম্যের অবসান ঘটিয়ে একটি ন্যায্যভিত্তিক ও ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠার পথ দেখিয়েছে-তা অনুধাবনের উদ্দেশ্যে আলোচনাটিকে দুটি প্রধান ভাগে উপস্থাপন করা হলো।

মানবসমাজ যখনই বর্ণবাদ, ভৌগোলিক সংকীর্ণতা, ভাষাগত বৈষম্য এবং অহেতুক অভিজাত্যের মোহে অন্ধ হয়ে ধ্বংসের মুখোমুখি হয়েছে, তখনই সাম্য, প্রীতি ও ভ্রাতৃত্বের এক মহা বার্তা নিয়ে আবির্ভূত হয়েছে ইসলাম। ইসলাম কেবল একটি ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতা বা উপাসনা পদ্ধতি নয়, বরং এটি একটি সার্বজনীন জীবনব্যবস্থা, যা ভিন্ন মত, ভিন্ন পথ এবং ভিন্ন জাতির মানুষকে একটি স্থায়ী সামাজিক বন্ধনে আবদ্ধ করতে শেখায়। আরবি ‘ইসলাম’ শব্দের অর্থই হলো শান্তি ও আনুগত্য। আর এই শান্তির মূল ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে পারস্পরিক শ্রদ্ধা, ন্যায্যবিচার এবং জাতিগত সম্প্রীতির উপর।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নবুওয়াত লাভের পূর্বে বিশ্বের সার্বিক সামাজিক অবস্থা পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, তৎকালে মানবসমাজ তীব্র অন্ধ জাতিগত বিদ্বেষ এবং গোত্রীয় অহংকারে নিমজ্জিত ছিল। এই জাহিলি (অন্ধকারময়) অভিজাত্যবোধ ও গোত্রপ্রীতি মানুষকে একে অপরের শত্রু বানিয়ে দিয়েছিল। ইসলাম এসে অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে এই কৃত্রিম বৈষম্যের প্রাচীর গুঁড়িয়ে দেয়। ইসলাম ঘোষণা করেছে-সমস্ত মানুষ এক ও অদ্বিতীয় স্রষ্টার সৃষ্টি এবং একমাত্র পিতা আদম (আ.) ও মাতা হাওয়া (আ.)-এর সন্তান। জাতিগত সম্প্রীতি রক্ষায় ইসলামের এই ঐতিহাসিক ও অবিস্মরণীয় অবদানকে অনুধাবন করার সুবিধার্থে সমগ্র আলোচনাটিকে দুটি প্রধান ভাগে উপস্থাপন করা হলো:

ইসলামী আকীদা, কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে জাতিগত সম্প্রীতির মৌলিক সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি, ইসলামের মূল্যবোধ কেবল মৌখিক উপদেশে সীমাবদ্ধ নয়; বরং তা আকীদা, আসমানী গ্রন্থ আল-কুরআন এবং প্রিয় নবী (ﷺ)-এর সুন্নাহর মাধ্যমে সামাজিক রীতিনীতিতে স্থায়ীভাবে প্রোথিত করা হয়েছে।

জাতিগত সম্প্রীতির আকীদাগত মূলভিত্তি

মানবজাতির একক উৎস, ইসলাম অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, পৃথিবীর সকল মানুষের মূল এক। রক্ত, মাংস, হাড় এবং আত্মার দিক থেকে মানুষের মধ্যে মৌলিক কোনো ফারাক নেই। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেন, হে মানবজাতি! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় করো, যিনি তোমাদের এক ব্যক্তি (আদম) থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তার থেকে তার স্ত্রীকে সৃষ্টি করেছেন, আর তাঁদের দুজন থেকে ছড়িয়ে দিয়েছেন বহু পুরুষ ও নারী। (সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১)

এই আয়াত মানবজাতির আদি ঐক্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। যখন একজন মানুষ উপলব্ধি করে যে পৃথিবীর সকল মানুষ একই মূল শিকড় থেকে এসেছে, তখন বর্ণ, জাতি বা গোত্রভিত্তিক ভেদাভেদ স্বয়ংক্রিয়ভাবেই বিলুপ্ত হয়ে যায়।

ভিন্নতার উদ্দেশ্য: পরিচয়, বিভেদ নয়

বিশ্বের বিভিন্ন বর্ণ, ভাষা এবং সংস্কৃতির বিচিত্রতা কোনো অভিশাপ নয়, বরং এটি আল্লাহর মহিমা এবং সৌন্দর্য। আল্লাহ বলেন: হে মানবজাতি! আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী হতে, আর তোমাদের বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পারো। নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সম্মানিত ব্যক্তি সে-ই, যে সবচেয়ে বেশি তাকওয়াবান (আল্লাহভীরু)। (সূরা আল-হুজুরাত, আয়াত: ১৩) এই বিশ্বজনীন আয়াতটি প্রমাণ করে যে, সমাজে জাতি ও গোত্রের সৃষ্টি করা হয়েছে শুধুমাত্র পারস্পরিক পরিচয়ের সুবিধার্থে, বৈষম্য বা ঘৃণার দেয়াল তোলার জন্য নয়।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ঐতিহাসিক প্রয়াশ ও বিদায় হজ্জের ভাষণ: বিদায় হজ্জের ঐতিহাসিক সনদ মানবজাতির ইতিহাসে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানবাধিকার ও সম্প্রীতির সনদ হিসেবে বিবেচনা করা হয় বিদায় হজ্জের ভাষণকে। আরাফাতের ময়দানে লাখো মানুষের উপস্থিতিতে মহানবী (সা.)

জাতিগত বৈষম্য চিরতরে বিলুপ্ত ঘোষণা করে বলেন: হে মানুষ সকল! জেনে রেখো, তোমাদের প্রতিপালক একজন এবং তোমাদের পিতা (আদম)-ও একজন। অনারবের ওপর কোনো আরবের শ্রেষ্ঠত্ব নেই, আরবের ওপর কোনো অনারবের শ্রেষ্ঠত্ব নেই। সাদার ওপর কালোর কিংবা কালোর ওপর সাদার কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই—শ্রেষ্ঠত্বের একমাত্র মানদণ্ড হলো 'তাকওয়া' বা পরহেযগারী। (মুসনাদে আহমাদ)

এই বক্তব্যের মাধ্যমে ইসলাম বিশ্বসমাজ থেকে বর্ণবাদ (Racism) ও বংশীয় আভিজাত্যের (Ethnocentrism) শিকড় সমূলে উৎপাটন করে।

ঐতিহাসিক 'মদিনা সনদ'

হিজরতের পর রাসূলুল্লাহ (সা.) মদিনায় বিভিন্ন ধর্ম ও সম্প্রদায়ের লোকজনকে নিয়ে যে লিখিত চুক্তি তৈরি করেছিলেন, তা ইতিহাসের প্রথম লিখিত সংবিধান বা 'মদিনা সনদ' নামে পরিচিত। এই সনদে উল্লেখ ছিল মদিনায় বসবাসকারী মুসলিম, ইহুদি এবং অন্যান্য পৌত্তলিক জাতিগোষ্ঠী মিলে একটি 'একক উম্মাহ' বা রাষ্ট্রীয় সম্প্রদায় গঠন করবে। প্রত্যেক ধর্মীয় ও সামাজিক জাতিগোষ্ঠী নিজ নিজ ধর্ম পালন ও অভ্যন্তরীণ বিচার ব্যবস্থা পরিচালনায় স্বাধীন থাকবে। বাহ্যিক শত্রুর আক্রমণের মুখে সকল জাতি ও সম্প্রদায় সম্মিলিতভাবে মদিনা রক্ষা করবে। এই সনদ প্রমাণ করে যে, ইসলাম বহুজাতিক ও বহুধর্মীয় সমাজে শান্তি ও সহাবস্থান নিশ্চিত করার বাস্তব রূপরেখা প্রদান করেছে। সার্বজনীন ইসলামিক ইবাদতে সম্প্রীতির প্রতিফলন, ইসলামী ইবাদতের শারীরিক ও সামাজিক অবকাঠামো এমনভাবে নির্মিত যা মানুষের মধ্যকার শ্রেণীভেদ ও বর্ণবাদ দূর করে। সম্প্রীতি ও বৈষম্যহীনতার বৈশ্বিক নিদর্শন। সালাত (নামাজ) দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাতে একই কাতারে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়ান ধনকুবের ও দরিদ্র, রাজা ও প্রজা, সাদা ও কালো মানুষ। সালাতের কাতারে কোনো বিশেষ শ্রেণীর জন্য জায়গা সংরক্ষিত থাকে না।

হজ্জ প্রতি বছর বিশ্বের কোণায় কোণায় ছড়িয়ে থাকা শত শত জাতির লাখ লাখ মানুষ একই পোশাক (ইহরাম) পরিধান করে 'লাব্বাইক' ধ্বনিতে প্রকম্পিত করে তোলে। এটি বিশ্বভ্রাতৃত্বের এক অনুপম বাস্তব প্রদর্শন। জাকাত এটি কেবল অর্থ সাহায্য নয়, বরং ধনী ও দরিদ্রের মধ্যকার সামাজিক ব্যবধান হ্রাস করে ভালোবাসার বন্ধন তৈরি করার আর্থসামাজিক, সংখ্যালঘু অধিকার, ধর্মনিরপেক্ষ সহাবস্থান ও আধুনিক বিশ্ব প্রেক্ষাপটে ইসলাম।

অমুসলিম ও সংখ্যালঘুদের জাতিগত ও ধর্মীয় অধিকার সুরক্ষায় ইসলাম:

ইসলামের বিজয়ের যুগে বিজিত অঞ্চলের ভিন্ন জাতি ও ধর্মের মানুষের অধিকার রক্ষায় ইসলাম যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে, তা বিশ্ব ইতিহাসে বিরল। অমুসলিমদের অধিকার নিশ্চিত করতে গিয়ে মহানবী (সা.) কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেছেন:

মনে রেখো, যে ব্যক্তি কোনো চুক্তিবদ্ধ অমুসলিম নাগরিকের ওপর অত্যাচার করে, তার অধিকার খর্ব করে, তার ওপর সাধ্যের অতিরিক্ত বোঝা চাপিয়ে দেয় বা তার অনিচ্ছায় কোনো কিছু ছিনিয়ে নেয়-কিয়ামতের দিন আমি স্বয়ং তার বিরুদ্ধে মামলা লড়ব। (আবু দাউদ) ধর্মে কোনো জোর-জবরদস্তি নেই, ইসলাম কোনো জাতিকে জোরপূর্বক ধর্ম পরিবর্তন বা তাদের সংস্কৃতি বিলুপ্ত করার অনুমতি দেয় না। কুরআনের সুনির্দিষ্ট নীতি হলো, ধর্মে কোনো জোর-জবরদস্তি নেই। (সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ২৫৬) এমনকি বিজিত অঞ্চলের মন্দির, গির্জা বা প্যাগোডা ধ্বংস করা তো দূরের কথা, যুদ্ধের ময়দানেও উপাসনালয় ও সেগুলোর ধর্মযাজকদের আঘাত করা ইসলামী যুদ্ধনীতিতে সম্পূর্ণ হারাম। ইতিহাসে ইসলামী শাসনব্যবস্থায় সম্প্রীতির সোনালী দৃষ্টান্ত, ইতিহাসের পাতা উল্টালে দেখা যায়, ইসলামী শাসনামলগুলোতে ভিন্ন বর্ণ ও জাতির মানুষ কীভাবে পূর্ণ নিরাপত্তা ও সম্মান নিয়ে বসবাস করেছে।

হযরত উমর (রা.)-এর জেরুজালেম বিজয়, জেরুজালেম বিজয়ের পর খলিফা উমর (রা.) খ্রিস্টান অধিবাসীদের নিরাপত্তার যে ঐতিহাসিক প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন (উমর সনদ), তা ছিল অসাধারণ। তিনি যখন খ্রিস্টানদের চার্চ অব দ্য হোলি সেপালকারে ছিলেন, তখন সালাতের সময় হওয়া সত্ত্বেও চার্চের ভেতরে সালাত আদায় করেননি-যাতে পরবর্তী যুগের মুসলিমরা সেটিকে মসজিদ বানানোর দাবি না করে।

আব্বাসীয় ও আন্দালুসিয়ার (স্পেন) স্বর্ণযুগ: স্পেনে মুসলিম শাসনামলে (কর্ডোভা ও গ্রানাডা) খ্রিস্টান, ইহুদি ও মুসলিমরা পাশাপাশি শান্তিতে বসবাস করত। ইতিহাসবিদরা এই সময়কে ইহুদিদের জন্য "স্বর্ণযুগ" বলে আখ্যায়িত করেছেন, কারণ ইউরোপের অন্য অঞ্চলে যখন ইহুদিদের ওপর নির্মম অত্যাচার চলছিল, তখন ইসলামী স্পেনে তারা শাসনকাজ, বিজ্ঞান ও দর্শনে সমান সুযোগ পাচ্ছিল।

বিশিষ্ট সাহাবী বিলাল (রা.) ও হালমান আল-ফারিসী (রা.) ইসলামের প্রাথমিক যুগেই বর্ণবাদের মূলে কুঠারাঘাত করা হয়েছিল। আবিসিনিয়ার

কৃষ্ণদাস দাস হযরত বিলাল (রা.)-কে করা হয়েছিল ইসলামের প্রথম 'মুয়াজ্জিন' (আজান দাতা) এবং মক্কা বিজয়ের পর কাবার ছাদে উঠে আজান দেওয়ার বিরল সম্মান তাঁকে দেওয়া হয়। পারস্যের ছালমান আল-ফারিসী (রা.) এবং রোমের সুহাইব (রা.)-কে আরবী সাহাবীদের সমকক্ষ ও ভাইয়ের মর্যাদায় ভূষিত করা হয়।

আধুনিক বিশ্ব, বর্ণবাদ সংকট ও ইসলামী সমাধানের প্রাসঙ্গিকতা:

বর্তমান একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়েও পৃথিবীজুড়ে বর্ণবাদ, জাতিগত দাঙ্গা, উগ্র জাতীয়তাবাদ এবং সংখ্যালঘু নির্যাতনের চিত্র আমরা দেখতে পাই। জাতীয়তাবাদের বিপরীতে উম্মাহর ধারণা, উগ্র জাতীয়তাবাদ (Ultra-Nationalism) যখন বিশ্বকে প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মতো ভয়াবহ ধ্বংসের মুখোমুখি করেছে, তখন ইসলাম প্রদান করেছে 'বিশ্বজনীন সাম্য' বা 'উম্মাহ'-র ধারণা। ইসলাম স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, অন্যায় ও জুলুমের ক্ষেত্রে নিজের জাতি বা গোত্রের অন্ধ সমর্থন করা যাবে না। মহানবী (সা.) বলেন: যে ব্যক্তি আসাবিয়াত (অন্ধ গোত্রপ্রীতি বা বর্ণবাদের) দিকে আহ্বান করে, অথবা আসাবিয়াতের ওপর যুদ্ধ করে, সে আমাদের দলভুক্ত নয়। (আবু দাউদ)

ন্যায়বিচার ও মানবাধিকার রক্ষা: ইসলামী শরিয়তে জাতি বা ধর্মের ভিত্তিতে বিচারে বৈষম্য করার কোনো সুযোগ নেই। শত্রু হলেও তার সাথে ন্যায়বিচার করার নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ বলেন: কোনো সম্প্রদায়ের শত্রুতা যেন তোমাদের বিচারকাজে ইনসাফ বর্জন করতে প্ররোচিত না করে। তোমরা সুবিচার করো, এটিই তাকওয়ার নিকটতর। (সূরা আল-মায়দা, আয়াত: ৮)

পরিশেষে বলা যায়, জাতিগত সম্প্রীতি ও মানবিক ঐক্য প্রতিষ্ঠা ইসলামী জীবনদর্শনের একটি মৌলিক শিক্ষা। ইসলাম মানুষের মধ্যে বিদ্যমান কৃত্রিম বৈষম্য, বর্ণবাদ, গোত্রীয় অহংকার ও বংশীয় শ্রেষ্ঠত্বের ধারণাকে প্রত্যাখ্যান করে সকল মানুষকে একই স্রষ্টার সৃষ্টি হিসেবে সম্মান ও মর্যাদা প্রদান করেছে। ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষের প্রকৃত মর্যাদা নির্ধারিত হয় তার বংশ, বর্ণ, ভাষা বা সম্পদের মাধ্যমে নয়; বরং ঈমান, তাকওয়া, ন্যায়পরায়ণতা ও উত্তম চরিত্রের মাধ্যমে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পবিত্র জীবনদর্শ, মদিনা সনদের মানবিক নীতি, বিদায় হজের ঐতিহাসিক ভাষণে ঘোষিত সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের বার্তা এবং খোলাফায়ে

রাশেদীনের ন্যায়ভিত্তিক শাসনব্যবস্থা বিশ্ববাসীর সামনে জাতিগত সম্প্রীতির এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। তাঁরা প্রমাণ করেছেন যে, ভিন্ন ভাষা, বর্ণ, সংস্কৃতি ও পরিচয়ের মানুষও পারস্পরিক সম্মান, ন্যায়বিচার ও ভালোবাসার ভিত্তিতে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করতে পারে। বর্তমান বিশ্বে যখন বর্ণবাদ, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ, জাতিগত সংঘাত ও সামাজিক বৈষম্য মানবসভ্যতার জন্য বড় হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে, তখন ইসলামের সাম্য, ভ্রাতৃত্ব ও ইনসাফের শিক্ষা আরও বেশি প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। একটি বৈষম্যহীন, শান্তিপূর্ণ ও মানবিক সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন ইসলামের সেই মহান আদর্শকে বাস্তব জীবনে ধারণ করা।

অতএব, জাতিগত সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা শুধু সামাজিক প্রয়োজন নয়; বরং এটি মানবতার কল্যাণ ও শান্তির জন্য অপরিহার্য। ইসলামী মূল্যবোধ অনুসরণ করে যদি মানুষ পারস্পরিক শ্রদ্ধা, সহমর্মিতা ও ন্যায়বিচারের পথে অগ্রসর হয়, তবে পৃথিবী হতে পারে আরও সুন্দর, শান্তিপূর্ণ ও সম্প্রীতিময়। এটাই ইসলামের সার্বজনীন মানবিক আহ্বান।

লেখক: অধ্যক্ষ, কাঞ্চনা ইসলামিয়া আলিম মাদরাসা,
সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম।

১৯ দিন ব্যাপী ৫২ তম মাহফিলে মাহফিলে সীরতুনবী (সঃ) ২০২৬ ইং

কিয়ামতের ময়দানে শানে মোস্তফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)
মুহাম্মদ শহীদুল হক হোসাইনী

বিশ্ব মানবতার মুক্তির কান্ডারী রহমতে দো ‘আলম হুজুরে আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তা‘আলার সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি এবং সকল নবী-রাসূলের মধ্যে সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী। তাঁর এই মর্যাদা দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জগতেই প্রতিষ্ঠিত। তবে কিয়ামতের দিন তাঁর সর্বোচ্চ মর্যাদা পূর্ণরূপে প্রকাশিত হবে। তখন সমগ্র মানবজাতি তাঁর নেতৃত্ব, সুপারিশ ও সম্মানের সাক্ষী হবে। ইসলামী আকীদা অনুযায়ী সমস্ত নবী ও রাসূলগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হলেন আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এ বিষয়ে পবিত্র কুরআন ও সহীহ হাদীসে সুস্পষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান। যেমন: জামে তিরমিযী শরীফের বর্ণনায় এসেছে-
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا فَخْرَ، وَبَيِّدُ لِوَاءِ الْحَمْدِ، وَلَا فَخْرَ، وَمَا مِنْ نَبِيٍّ يَوْمَئِذٍ آدَمَ فَمَنْ سِوَاهُ إِلَّا تَحْتَ لَوَائِي، وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ، وَلَا فَخْرَ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

ভাষান্তর : হযরত আবু সাঈদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, “কিয়ামতের দিন আমি আদম আলাইহিস সালাম এর সকল সন্তানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, সম্মানিত ও সর্বোচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তি। এতে আমার কোনো অহংকার নেই। আমার হাতেই থাকবে ‘লিওয়াউল হামদ’ (প্রশংসার পতাকা) এতেও আমার কোনো অহংকার নেই। সে দিন আদম আলাইহিস সালাম থেকে শুরু করে সকল নবী আমার পতাকার নিচে থাকবেন। আর কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম আমার জন্যই কবর বিদীর্ণ হবে এতেও আমার কোনো অহংকার নেই। ৬৮

হাদীসের ব্যাখ্যা ও প্রাসঙ্গিক আলোচনা

سَيِّدٌ (সাইয়্যেদুন) শব্দটির বিশ্লেষণ: আরবি ভাষায় سَيِّدٌ শব্দটি سَادٌ يَسُودُ থেকে এসেছে। এর অর্থ- নেতা, সর্দার, শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, সম্মানিত ব্যক্তি, যার নেতৃত্ব ও আনুগত্য গ্রহণ করা হয়। ইমাম ইবনুল আসীর (রহ.) বলেন: **السَّيِّدُ هُوَ الَّذِي فَاقَ قَوْمَهُ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرَفِ** অর্থাৎ, “যিনি কল্যাণ ও মর্যাদায় তাঁর জাতির সবার উপরে তিনিই ‘সাইয়্যিদ’।” سَيِّدٌ শব্দের একটি

শাব্দিক অর্থ নেতা তার পরও এটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শানে প্রযোজ্য নয়। উক্ত বিষয়ে কুরআন, হাদীস ও আকিদার কিতাবে দালিলিক আলোচনা বিদ্যমান। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন : لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا অর্থাৎ, “তোমরা রাসূলকে আহ্বান করার মধ্যে তোমাদের একে অপরকে আহ্বান করার মতো করো না।”^{৬৭}

وَلَدِ آدَمَ (আদমের সন্তান) : আরবি وَلَدٌ শব্দটি (ولد د) ধাতু থেকে এসেছে। এর অর্থ: সন্তান, বংশধর, উত্তরসূরি, জন্মগ্রহণকারী ব্যক্তি। لِسَانُ الْعَرَبِ- নামক বিশ্ববিখ্যাত আরবি অভিধানে লিখা হয়েছে- الْوَلَدُ اسْمٌ يَقَعُ عَلَى الْأَرْثِ অর্থাৎ, “ওয়ালাদ” শব্দটি ছেলে-মেয়ে উভয়ের জন্য এবং একবচন ও সমষ্টিগত অর্থে ব্যবহৃত হয়। অতএব, سَيِّدٌ অর্থ কেবল সম্মানিত ব্যক্তি নন; বরং হযরত আদম আলাইহিস সালাম এর সমগ্র বংশধরদের মধ্যে সর্বোচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন।

أَنَا سَيِّدٌ وَلَدِ آدَمَ (আমি আদম সন্তানের সরদার): এখানে “سَيِّدٌ” (সাইয়্যিদ) অর্থ: শ্রেষ্ঠ, সম্মানিত ও সর্বোচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি। অর্থাৎ কিয়ামতের দিন সমগ্র মানবজাতি-নবী, রাসূল, সিদ্দীক, শহীদ ও নেককার সকল মানুষের মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী হবেন।

يَوْمَ الْقِيَامَةِ (কিয়ামতের দিন) : কিয়ামতের দিন তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ পাবে বিশেষভাবে। তিনি তখন বহু সম্মানে ভূষিত হবেন, যেমন- সর্বপ্রথম পুনরুত্থিত হবেন। মহান শাফা'আতের অধিকারী হবেন। তাঁর হাতেই থাকবে لَوَاءُ الْحَمْدِ (লিওয়াউল হামদ) তথা প্রশংসার পতাকা। তিনি সর্বপ্রথম জান্নাতের দরজা খুলবেন।

وَلَا فَخْرَ (কোন অহংকার নেই) : এতে আমার কোনো অহংকার নেই” এর অর্থ হলো- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের মর্যাদা অহংকার বা আত্ম প্রশংসার জন্য বলেননি। বরং আল্লাহ তা'আলা তাঁকে যে মর্যাদা দান করেছেন, তা উম্মতকে জানিয়ে দিয়েছেন। যেন তারা তাঁর যথাযথ মর্যাদা উপলব্ধি করতে পারে। ইমাম আন-নাওয়াবী (রহ.) বলেন,

^{৬৭} আল কুরআন, ২৪:৬৩

وَلَا فُحْرُ অর্থ হলো-আমি এই কথা গর্বের জন্য বলছি না; বরং আল্লাহর দেওয়া নিয়ামতের সংবাদ দিচ্ছি এবং উম্মাতকে শিক্ষা দিচ্ছি।

لَوَاءُ الْحَمْدِ: (আমার হাতেই থাকবে প্রশংসার পতাকা): وَبِيَدِي لَوَاءُ الْحَمْدِ (লিওয়াউল হামদ) এমন একটি বিশেষ পতাকা, যা কিয়ামতের দিন শুধুমাত্র রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে প্রদান করা হবে। এটি তাঁর সর্বোচ্চ নেতৃত্ব ও সম্মানের প্রতীক। **إِلَّا تَحْتَ لِوَانِي** অর্থঃ কিয়ামতের দিন সকল নবী আল্লাহর বান্দাহ হিসেবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এই বিশেষ সম্মান ও নেতৃত্বের প্রকাশের সাক্ষী হবেন। এটি তাঁর শ্রেষ্ঠ মর্যাদার বহিঃপ্রকাশ; এতে অন্য কোনো নবী-রাসূলগণের মর্যাদা হ্রাস পায় না।

وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ تَنْشِقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ (আমিই প্রথম ব্যক্তি যার উপর থেকে যমিন বিদীর্ণ হবে): কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কবর উন্মুক্ত হবে এবং তিনিই সর্বপ্রথম পুনরুত্থিত হবেন। এটিও তাঁর বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

কিয়ামতের ময়দানে নবীজির সুপারিশ: সহীহ হাদিসের আলোকে

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دَعْوَةٍ، «فَرُفِعَ إِلَيْهِ الذَّرَّاعُ، وَكَانَتْ تُعْجِبُهُ فَهَسَ مِنْهَا نَهْسَةً» وَقَالَ: "أَنَا سَيِّدُ الْقَوْمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، هَلْ تَذَرُونَ بِي؟ يَجْمَعُ اللَّهُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ، فَيُبْصِرُهُمُ النَّاطِرُ وَيُسْمِعُهُمْ [ص: ١٣٥] الدَّاعِي، وَتَذْنُو مِنْهُمْ الشَّمْسُ، فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ: أَلَا تَرَوْنَ إِلَى مَا أَنْتُمْ فِيهِ، إِلَى مَا بَلَّغَكُمْ؟ أَلَا تَنْظُرُونَ إِلَى مَنْ يَشْفَعُ لَكُمْ إِلَى رَبِّكُمْ، فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ: أَبُوكُمْ آدَمُ فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُونَ: يَا آدَمُ أَنْتَ أَبُو الْبَشَرِ، خَلَقَكَ اللَّهُ بِيَدِهِ، وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ، وَأَمَرَ الْمَلَائِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ، وَأَسْكَنْكَ الْجَنَّةَ، أَلَا تَشْفَعُ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، أَلَا تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ وَمَا بَلَّغْنَا؟ فَيَقُولُ: رَبِّي غَضِبَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَا يَغْضَبُ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَنَهَانِي عَنِ الشَّجَرَةِ فَعَصَيْتُهُ، نَفْسِي نَفْسِي، أَذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي، أَذْهَبُوا إِلَى نُوحٍ، فَيَأْتُونَ نُوحًا، فَيَقُولُونَ: يَا نُوحُ، أَنْتَ أَوَّلُ الرُّسُلِ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ، وَسَمَّاكَ اللَّهُ عَبْدًا شَكُورًا، أَمَا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ، أَلَا تَرَى إِلَى مَا بَلَّغْنَا، أَلَا تَشْفَعُ لَنَا إِلَى رَبِّكَ؟ فَيَقُولُ: رَبِّي غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَا يَغْضَبُ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، نَفْسِي نَفْسِي، انْثُوا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَيَأْتُونِي فَأَسْجُدُ تَحْتَ الْعَرْشِ، فَيَقَالُ يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ، وَاشْفَعْ تَشْفَعُ، وَسَلِّ تَعْطُهُ " قَالَ مُحَمَّدٌ بْنُ عُبَيْدٍ: لَا أَحْفَظُ سَانِرَهُ (رواه البخاري، رقم الحديث: ٣٣٤٠)

ভাষান্তর: হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে এক যিয়াফতে উপস্থিত ছিলাম। তার সামনে রান্না করা ছাগলের বাছ পেশ করা হলো। এটা তার কাছে পছন্দনীয় ছিল। তিনি সেখান থেকে এক টুকরা খেলেন এবং বললেন, আমি কিয়ামতের দিন সমগ্র মানবজাতির সরদার হবো। তোমরা কী জান আল্লাহ তায়ালা কীভাবে কিয়ামতের দিন একই সমতলে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল মানুষকে একত্র করবেন? যেন একজন দর্শক তাদের সবাইকে দেখতে পান এবং একজন আহবানকারীর ডাক সবার নিকট পৌঁছে যায়। সূর্য তাদের অতি নিকটে এসে যাবে। তখন কোন কোন মানুষ বলবে, তোমরা কি লক্ষ্য করনি? তোমরা কী অবস্থায় আছো এবং কী পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছো? তোমরা কি এমন ব্যক্তিকে খুঁজে বের করবে না যিনি তোমাদের জন্য তোমাদের রবের নিকট সুপারিশ করবেন? তখন কিছু লোক বলবে, তোমাদের আদি পিতা আদম আলাইহিস সালাম আছেন, চলো তার কাছে যাই। তখন সকলে তার কাছে গিয়ে বলবে, হে আদম! আপনি সকল মানব জাতির পিতা। আল্লাহ তায়ালা আপনাকে নিজ হাতে সৃষ্টি করেছেন এবং তার পক্ষ থেকে আপনার কাছে রূহ ফুঁকেছেন। তিনি ফেরেশতাদেরকে আপনার সম্মানে সেজদার নির্দেশ দিয়েছেন। সে অনুযায়ী সকলে আপনাকে সেজদাও করেছে। তিনি আপনাকে জান্নাতে বসবাস করতে দিয়েছেন। আপনি কি আমাদের জন্য আপনার রবের দরবারে সুপারিশ করবেন না? আপনি দেখেন না আমরা কী অবস্থায় আছি এবং কী কষ্টের সম্মুখীন হয়েছি। তখন তিনি বলবেন, আমার রব আজ এমন রাগান্বিত হয়েছেন, ইতিপূর্বে তিনি এমন রাগান্বিত হননি আর পরেও এমন রাগান্বিত হবেন না। আর তিনি আমাকে বৃক্ষটি থেকে (ফল খেতে) নিষেধ করেছিলেন। তখন আমি ভুল করেছি। এখন আমি নিজের চিন্তায় ব্যস্ত। তোমরা আমি ব্যতীত অন্যের কাছে চলে যাও। তোমরা নূহের কাছে চলে যাও। তখন তারা নূহ আলাইহিস সালাম এর কাছে এসে বলবে, হে নূহ! পৃথিবী বাসীদের আপনিই প্রথম রাসূল এবং আল্লাহ তায়ালা আপনার নাম রেখেছেন কৃতজ্ঞ বান্দাহ। আপনি কী লক্ষ্য করছেন না? আমরা কী ভয়বাহ অবস্থায় পড়ে আছি। আপনি দেখছেন না? আমরা কতইনা দুঃখ কষ্টের মধ্যে সম্মুখীন হয়ে আছি। আপনি কি আমাদের জন্য আপনার রবের কাছে সুপারিশ করবেন না? তখন তিনি বলবেন, আমার রব আমার নিকট আজ এমন রাগান্বিত হয়ে আছেন, যা ইতোপূর্বে হন নাই এবং এমন রাগান্বিত

পরেও হবেন না। এখন আমি নিজের চিন্তায় ব্যস্ত। তোমরা নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে চলে যাও। তখন তারা আমার কাছে আসবে। আর আমি আরশের নিচে সেজদায় পড়ে যাব। তখন বলা হবে, হে মুহাম্মদ আপনার মাথা উঠান এবং সুপারিশ করুন। আপনার সুপারিশ গ্রহণ করা হবে। আর আপনি যা চান, আপনাকে তাই দেয়া হবে। মুহাম্মদ ইবনে উবাইদ র. বলেন, হাদিসের সকল অংশ আমি মুখস্ত করতে পারিনি।⁷⁰

কিয়ামতের দিন নবীজির ১০টি বিশেষ মর্যাদা

- ১। اِثْقَاقُ الْقَبْرِ : সর্বপ্রথম কবর থেকে পুনরুত্থিত হবেন। নবীজি ইরশাদ করেন, أَنَا أَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ “কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম আমার জন্যই পৃথিবী (কবর) বিদীর্ণ হবে।”⁷¹
- ২। لِوَاءِ الْحَمْدِ : লিওয়াউল হামদ (প্রশংসার পতাকা) এর অধিকারী হবেন। নবীজি ইরশাদ করেন, وَبِيْدِي لِوَاءِ الْحَمْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فُخْرٌ অর্থাৎ “কিয়ামতের দিন প্রশংসার পতাকা (লিওয়াউল হামদ) আমার হাতেই থাকবে এতে কোনো অহংকার নেই।”⁷²
- ৩। الْشَّفَاعَةُ الْكُبْرَى : শাফাআতে কুবরা (মহা-সুপারিশ)-এর অধিকারী হবেন মানুষ। হযরত আদম আলাইহিস সালাম নূহ আঃইবরাহীম আলাইহিস সালাম, মূসা আলাইহিস সালাম ও ঈসা আলাইহিস সালাম এর কাছে যাবে; তাঁরা অপারগতা প্রকাশ করবেন। শেষে সবাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এলে তিনি আল্লাহর দরবারে সিজদা করবেন এবং সুপারিশ করবেন।⁷³
- ৪। فَرَعُ بَابِ الْجَنَّةِ : সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশ করবেন। নবীজি ইরশাদ করেন, أَنَا أَوَّلُ مَنْ يَفْرَعُ بَابَ الْجَنَّةِ অর্থাৎ “আমি সর্বপ্রথম জান্নাতের দরজার কড়া নাড়ব।”⁷⁴

⁷⁰ সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩৩৪০, মূল কিতাব-৪৭০ পৃষ্ঠা

⁷¹ সহীহ মুসলিম, হাদীস ২২৭৮

⁷² জামে তিরমিজি, হাদীস নং ৩৬১৫

⁷³ সহীহ বুখারী, হাদীস ৪৪৭৬ ; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৯৪

⁷⁴ সহীহ মুসলিম, হাদীস ১৯৭

- ৫। فَتْحُ بَابِ الْجَنَّةِ : জান্নাতের দরজা সর্বপ্রথম তাঁর জন্য খোলা হবে। নবীজি ইরশাদ করেন, ...أَتَى بَابَ الْجَنَّةِ فَأُسْتَفْتَحُ অর্থাৎ জান্নাতের প্রহরী বলবে: “আপনাকেই সর্বপ্রথম প্রবেশ করানোর আদেশ আমাকে দেওয়া হয়েছে।”^{৭৫}
- ৬। الْحَوْضُ الْكَوْثَرُ : হাউযে কাওসারের অধিকারী হবেন। আল্লাহ ইরশাদ করেন إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ অর্থাৎ “নিশ্চয়ই আমি আপনাকে কাওসার দান করেছি।”^{৭৬} হাউযে কাওসার সম্পর্কে বহু সহীহ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।^{৭৭}
- ৭। الْشَّفَاعَةُ لِلأُمَّةِ : নিজের উম্মতের জন্য সুপারিশ করবেন। নবীজি ইরশাদ করেন, وَاخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ অর্থাৎ “প্রত্যেক নবীর একটি বিশেষ দোয়া ছিল; আমি আমার সেই দোয়াকে আমার উম্মতের জন্য শাফাআতের উদ্দেশ্যে সংরক্ষণ করেছি।”^{৭৮}
- ৮। الْمَقَامُ الْمَحْمُودُ : মাকামে মাহমূদ লাভ করবেন। আল্লাহ তাআলা বলেন عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا অর্থাৎ “আশা করা যায়, আপনার প্রতিপালক আপনাকে প্রশংসিত স্থানে (মাকামে মাহমূদে) প্রতিষ্ঠিত করবেন।”^{৭৯} ইবন আব্বাস (রা.) সহ অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে, ‘মাকামে মাহমূদ’ হলো কিয়ামতের দিনের মহান শাফাআতের মর্যাদা।
- ৯। إِمَامُ الْأَنْبِيَاءِ : সকল নবীর ইমাম হবেন। মি’রাজের রাতেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বায়তুল মুকাদ্দাসে সকল নবীর ইমামতি করেন।^{৮০} এটি তাঁর সকল নবীর ওপর শ্রেষ্ঠত্ব ও নেতৃত্বের অন্যতম প্রমাণ।

^{৭৫} সহীহ মুসলিম, হাদীস ১৯৭

^{৭৬} আল কুরআন, ১০৮:১

^{৭৭} সহীহ বুখারী, হাদীস ৬৫৭৯ ; সহীহ মুসলিম হাদীস ২২৯২

^{৭৮} সহীহ বুখারী, হাদীস ৬৩০৪ ; সহীহ মুসলিম, হাদীস ১৯৯

^{৭৯} আল কুরআন, ১৭ : ৭৯

^{৮০} সহীহ মুসলিম, হাদীস ১৭২

১০। سَيِّدُ الْإِنْسَانِ : আদম (আ.) থেকে কিয়ামত পর্যন্ত সমগ্র মানবজাতির সৈয়দ হবেন। সর্বোপরি উপরোক্ত আলোচনার আলোকে স্পষ্ট হয় যে, **أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا فَخْرَ،** হাদীসটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সর্বোচ্চ মর্যাদা, কিয়ামতের দিনের নেতৃত্ব এবং শাফাআতের বিশেষ অধিকার প্রতিষ্ঠাকারী অন্যতম মৌলিক দলিল। প্রাচীন মুহাদ্দিসীন ও ব্যাখ্যাকারগণ এর ব্যাখ্যাও এই অর্থকে সমর্থন করে। অতএব, আলোচ্য হাদীসটি কেবল একটি ফযীলতের বর্ণনা নয়; বরং শানে রেছালত সম্পর্কে ইসলামী আকীদার একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি।

কিয়ামতের ময়দানে নবীজির শান বর্ণনা করতে গিয়ে প্রখ্যাত শায়ের ও আশেকে রাসূল মাওলানা হাসান রেযা বেরেলভী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন-

فقط اتنا سبب ہے انعقادِ بزمِ محشر کی + کہ انکی شان محبوبی
دکھائی جائے والی ہے

আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খাঁন ফাজেলে বেরেলভী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন-

آج لے انکی پناہ آج مدد مانگ ان سے + پھر نہ مانگے قیامت میں
اگر مان گیا

অর্থাৎ কিয়ামতের মহাসমাবেশ (মাহশার) অনুষ্ঠিত হওয়ার অন্যতম কারণ হলো- আল্লাহর প্রিয়তম হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনন্য প্রিয়ত্ব ও মর্যাদা সমগ্র সৃষ্টির সামনে প্রকাশ করা। আজই তাঁর (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর) আশ্রয় গ্রহণ কর, আজই তাঁর মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর; যদি আজ তোমার প্রার্থনা কবুল হয়ে যায়, তবে কিয়ামতের দিন আর চাইতে হবে না। তাই আমি শানে রেসালতের প্রতি আদব রক্ষার্থে সম্মানিত ও সর্বশ্রেষ্ঠ অর্থটি নিয়েছি।

প্রিয় নবীজির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের আবশ্যকতা

- তাফসীর ইবন কাসীরে রয়েছে- وَلَكِنْ لَا تَقُولُوا: يَا مُحَمَّدٌ، اَرْثَا، "তোমরা 'হে মুহাম্মদ' বলো না; বরং বলো 'হে আল্লাহর রাসূল', 'হে আল্লাহর নবী'।" কঠিন ও ভাষায় আদবের ব্যাপারে ইরশাদ করেন: لَا

اَرْثَا۟, “তোমরা নবীর কণ্ঠস্বরের উপর তোমাদের কণ্ঠস্বর উঁচু করো না।”^{৪১}

- ইমাম কুরতুবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, উক্ত আয়াত থেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি সর্বোচ্চ সম্মান প্রদর্শনের বিধান প্রমাণিত হয়।
- কাজী ইয়ায রহমাতুল্লাহি আলাইহি الشِّفَا بِتَغْرِيفِ حُقُوقِ اعْلَمَ أَنَّ مِنْ حُقُوقِهِ صَلَّى اللَّهُ -কিতাবে লিখেছেন- الْمُصْطَفَى اَرْثَا۟, “যে ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অন্যতম হক হলো তাঁকে সম্মান করা, মহিমাম্বিত করা এবং তাঁর মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখা। তিনি আরও লিখেন- مَنْ اسْتَحَفَّ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ تَنَقَّصَهُ فَقَدْ كَفَرَ. অর্থাৎ, “যে ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তুচ্ছজ্ঞান করে বা তাঁর মর্যাদা খাটো করে, সে কুফরিতে পতিত হয়।”
- ইমাম নববী রহমাতুল্লাহি আলাইহি الْأَذْكَارُ নামক কিতাবে তিনি লিখেন, لَا يَنْبَغِي أَنْ لَا يَذْكَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا مَعَ التَّوْقِيرِ. অর্থাৎ, “রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নাম সর্বদা পূর্ণ সম্মান ও শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করা উচিত।”
- ইমাম মালিক রহমাতুল্লাহি আলাইহি থেকে الشِّفَا بِتَغْرِيفِ حُقُوقِ اَرْثَا۟, “রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইস্তেকালের পরও তাঁর সম্মান জীবিত অবস্থার মতোই।”
- ইমাম ফতাবী رَضَوِيَّة নামক বিশ্ববিখ্যাত ফাতাওয়ার কিতাবে ইমাম আহমদ রেযা খান বেরেলভী (রহ.) লিখেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শানে এমন কোনো শব্দ, ভঙ্গি বা উপমা ব্যবহার করা বৈধ নয় যা তাঁর মর্যাদার পরিপন্থী বা সাধারণ অবমাননার ধারণা সৃষ্টি করে। তিনি বারবার تَعْظِيمُ الرَّسُولِ (রাসূলের তায়ীম)-কে ঈমানের অপরিহার্য অংশ হিসেবে আলোচনা করেছেন।

^{৪১} আল কুরআন, ৪৯:২

- **العقيدة الطحاوية** নামক বিখ্যাত আকীদার কিতাবের ব্যাখ্যাগুলোতে (বিশেষত: **إِبْنُ أَبِي الْعِزِّ الْحَنْفِيُّ** ও অন্যান্য **شَارِحِينَ** আলোচনায়) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি ভালোবাসা, সম্মান এবং তাঁর মর্যাদা রক্ষা ঈমানের অপরিহার্য দাবি হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

অতএব, দুনিয়া ও আখিরাতে শান্তি ও মুক্তি পেতে হলে আল্লাহর প্রিয় মাহবুব ছরকারে দো আলাম ফখরে বনী আদম জনাবে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রতি হৃদয়ের গভীরে প্রকৃত ভালবাসা লালন করে পরিপূর্ণ আনুগত্যের মাধ্যমে মহান সুপারিশ অর্জনের মাধ্যমে জান্নাতুল ফেরদৌসে যাওয়ার তাওফিক দান করুন, আমিন, বিহরমাতি সায্যিদিল মুরসালীন।

লেখক: প্রধান মুহাদ্দিস, শাহ্‌চান্দ আউলিয়া কামিল (স্নাতকোত্তর)

মাদরাসা, পটিয়া, চট্টগ্রাম।

১৯ দিন ব্যাপী ৫৩ তম মাহফিলে মাহফিলে সীরতুননবী (সঃ) ২০২৩ ইং
২য় দিবস

বিদায় হজ্জে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রদত্ত ভাষণের গুরুত্ব ও তাৎপর্য

আলহাজ মাওলানা ওবাইদুল্লাহ হামযা

মানবজাতির ইতিহাসে যে কয়েকটি ভাষণ যুগে যুগে সভ্যতা, ন্যায়বিচার ও মানবাধিকারের ভিত্তি স্থাপন করেছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিদায় হজ্জের ভাষণ তার মধ্যে অন্যতম। এটি ছিল মহানবী ﷺ-এর জীবনের শেষ হজ্জে, ১০ হিজরি সনের ৯ জিলহজ্জ আরাফাতের ময়দানে প্রদত্ত ঐতিহাসিক ভাষণ। এতে তিনি ইসলামের মৌলিক নীতিমালা, মানবাধিকার, সামাজিক ন্যায়বিচার, নারী-পুরুষের পারস্পরিক অধিকার, অর্থনৈতিক ন্যায়নীতি, মুসলিম ভ্রাতৃত্ব এবং কুরআন-সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরার নির্দেশ প্রদান করেন। বিদায় হজ্জের ভাষণকে ইসলামের একটি সারসংক্ষেপ সংবিধান বলা হয়। কারণ এতে এমন সব নীতি ঘোষণা করা হয়েছে, যা কিয়ামত পর্যন্ত মানবজাতির জন্য কল্যাণকর ও প্রাসঙ্গিক। বিদায় হজ্জের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা হলো সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা। রাসূলুল্লাহ ﷺ এমন একটি সমাজ প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দিয়েছেন যেখানে ধনী-গরিব, শাসক-শাসিত এবং শক্তিশালী-দুর্বল-সবার অধিকার সমানভাবে রক্ষা করা হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন **إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ** (সূরা আন-নাহল: ৯০) বিদায় হজ্জের ভাষণ সমাজ থেকে জুলুম, প্রতারণা ও বৈষম্য দূর করে ন্যায় ও ইনস্যাফ প্রতিষ্ঠার শিক্ষা দেয়।

বিদায় হজ্জের পরিচয় রাসূলুল্লাহ ﷺ হিজরতের দশম বছরে জীবনের প্রথম ও শেষ হজ্জ আদায় করেন। এ হজ্জকে হজ্জাতুল বিদা (حجة الوداع) বা বিদায় হজ্জ বলা হয়। কারণ এ হজ্জের পর তিনি আর কোনো হজ্জ আদায় করেননি এবং অল্প কিছুদিন পর ইন্তেকাল করেন।

এ হজ্জে প্রায় এক লক্ষ বা তারও অধিক সাহাবি অংশগ্রহণ করেছিলেন। আরাফাতের বিস্তীর্ণ ময়দানে তাঁদের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ যে ভাষণ দেন, সেটিই ইতিহাসে “বিদায় হজ্জের ভাষণ” নামে পরিচিত।

বিদায় হজ্জের ঐতিহাসিক পটভূমি দীর্ঘ তেইশ বছর ধরে রাসূলুল্লাহ ﷺ ইসলামের দাওয়াত, শিক্ষা, সমাজ সংস্কার ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মহান দায়িত্ব পালন করেন। জাহিলিয়াতের অন্ধকারে নিমজ্জিত আরব সমাজকে তিনি ঈমান, ন্যায়বিচার ও মানবতার আলোয় আলোকিত করেন।

হিজরতের দশম বছরে যখন ইসলাম আরব উপদ্বীপে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, তখন মহানবী ﷺ মানবজাতির জন্য তাঁর চূড়ান্ত দিকনির্দেশনা হিসেবে এই ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করেন। অনেক সাহাবি তখনই উপলব্ধি করেছিলেন যে, এটি সম্ভবত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর শেষ জনসম্মুখ ভাষণ।

বিদায় হজ্জের ভাষণের উদ্দেশ্য, বিদায় হজ্জের ভাষণের উদ্দেশ্য ছিল, ইসলামের মৌলিক নীতিগুলো পুনরায় সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করা। মানুষের জান, মাল ও সম্মানের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। জাহিলিয়াতের সকল অন্যায় ও বৈষম্যের অবসান ঘটানো। মুসলিম উম্মাহকে কুরআন ও সুন্নাহর অনুসরণের নির্দেশ প্রদান। নারী-পুরুষের পারস্পরিক অধিকার ও দায়িত্ব নির্ধারণ। মানবজাতির মধ্যে সাম্য, ভ্রাতৃত্ব ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা।

১. মানুষের জীবন, সম্পদ ও সম্মানের নিরাপত্তা: রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘোষণা করেন "তোমাদের রক্ত, তোমাদের সম্পদ এবং তোমাদের সম্মান—এ দিন, এ মাস ও এ নগরীর মতোই পবিত্র।"

এই ঘোষণা ইসলামে মানবাধিকারের অন্যতম ভিত্তি। ইসলাম মানুষের জীবন, সম্পদ ও মর্যাদাকে অত্যন্ত সম্মানের সঙ্গে সংরক্ষণ করতে নির্দেশ দেয়। আল্লাহ তাআলা বলেন **وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ** আল্লাহ যে প্রাণকে সম্মানিত করেছেন, ন্যায়সঙ্গত কারণ ছাড়া তাকে হত্যা করো না। (সূরা আল-ইসরা: ৩৩)

২. সুদ (রিবা) সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ বিদায় হজ্জের ভাষণে রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘোষণা করেন জাহিলিয়াতের সমস্ত সুদ আজ থেকে রহিত করা হলো। সর্বপ্রথম আমি আমার চাচা আব্বাস ইবন আবদুল মুত্তালিবের সুদ রহিত করছি। এ ঘোষণার মাধ্যমে তিনি অর্থনৈতিক শোষণ ও অন্যায় লেনদেনের বিরুদ্ধে দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করেন। আল্লাহ বলেন **وَأَحْلَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا** আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন। (সূরা আল-বাকার: ২৭৫)

৩. জাহিলিয়াতের রক্তপ্রথা ও কুসংস্কারের অবসান: ইসলাম-পূর্ব যুগে প্রতিশোধ, গোত্রবাদ ও রক্তের বদলে রক্ত নেওয়ার প্রবণতা ব্যাপক ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘোষণা করেন জাহিলিয়াতের সকল রক্তের দাবি আজ থেকে বাতিল করা হলো। এর মাধ্যমে প্রতিহিংসা, গোত্রবাদ ও অরাজকতার পরিবর্তে ন্যায়বিচার, ক্ষমা ও শান্তির সমাজ প্রতিষ্ঠার ভিত্তি স্থাপন করা হয়।

৪. নারী অধিকারের ঘোষণা: বিদায় হজ্জের ভাষণে নারীদের অধিকার সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি বলেন তোমরা নারীদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো। তোমরা আল্লাহর আমানত হিসেবে তাদের গ্রহণ করেছ। তিনি আরও শিক্ষা দেন স্ত্রীদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করতে হবে। তাদের ভরণ-পোষণ ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। স্বামী-স্ত্রী উভয়ের পারস্পরিক অধিকার রক্ষা করতে হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ তোমরা তাদের সঙ্গে উত্তমভাবে জীবনযাপন করো। (সূরা আন-নিসা: ১৯)

৫. মুসলিম ভ্রাতৃত্ব ও সাম্য: রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘোষণা করেন প্রত্যেক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই। তিনি আরও বলেন কোনো আরবের ওপর অনারবের এবং কোনো অনারবের ওপর আরবের, কোনো শ্বেতাঙ্গের ওপর কৃষ্ণাঙ্গের এবং কোনো কৃষ্ণাঙ্গের ওপর শ্বেতাঙ্গের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই; শ্রেষ্ঠত্বের একমাত্র ভিত্তি হলো তাকওয়া। এই ঘোষণা বর্ণবাদ, জাতিগত বৈষম্য ও অহংকারের বিরুদ্ধে ইসলামের চিরন্তন নীতিমালা। এর সমর্থনে আল্লাহ বলেন إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক সম্মানিত সেই ব্যক্তি, যে সর্বাধিক তাকওয়াবান। (সূরা আল-হুজুরাত: ১৩)

৬. কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরার নির্দেশ: রাসূলুল্লাহ ﷺ উম্মতকে সতর্ক করে বলেন আমি তোমাদের মাঝে এমন দুটি জিনিস রেখে যাচ্ছি; যতদিন তোমরা তা দৃঢ়ভাবে ধারণ করবে, ততদিন কখনো পথভ্রষ্ট হবে না-আল্লাহর কিতাব এবং তাঁর রাসূলের সুন্নাহ। এই নির্দেশ মুসলিম জীবনের মৌলিক ভিত্তি। ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র সবক্ষেত্রে কুরআন ও সুন্নাহ অনুসরণই সফলতার পথ।

৭. আমানত ও দায়িত্ব পালনের নির্দেশ: রাসূলুল্লাহ ﷺ মানুষের অধিকার আদায় এবং আমানত রক্ষার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। আল্লাহ তাআলা বলেন إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا আল্লাহ

তোমাদের নির্দেশ দেন, তোমরা যেন আমানত তার হকদারের কাছে পৌঁছে দাও। (সূরা আন-নিসা: ৫৮)

১. মানবাধিকারের ভিত্তি প্রতিষ্ঠায় বিদায় হজ্জের ভাষণের গুরুত্ব: বিদায় হজ্জের ভাষণে রাসূলুল্লাহ ﷺ মানুষের জীবন, সম্পদ ও সম্মানকে পবিত্র ঘোষণা করেছেন। আধুনিক বিশ্বে যাকে মানবাধিকারের মৌলিক বিষয় বলা হয়, ইসলামে তা বহু আগেই ঘোষণা করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন তোমাদের রক্ত, তোমাদের সম্পদ এবং তোমাদের সম্মান তোমাদের জন্য পবিত্র। এই ঘোষণা মানুষের মৌলিক নিরাপত্তার নিশ্চয়তা প্রদান করে। কোনো ব্যক্তি অন্যায়ভাবে অন্যের জীবন, সম্পদ বা মর্যাদার ক্ষতি করতে পারে না। ইসলাম মানুষের অধিকারকে শুধু আইনগত বিষয় হিসেবে দেখেনি; বরং এটিকে আল্লাহর কাছে জবাবদিহিতার বিষয় হিসেবে বিবেচনা করেছে।

২. বর্ণবাদ ও জাতিগত বৈষম্য দূরীকরণে শিক্ষা: বিদায় হজ্জের ভাষণের অন্যতম যুগান্তকারী ঘোষণা ছিল মানবজাতির সাম্যের ঘোষণা। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন কোনো আরবের ওপর অনারবের এবং কোনো অনারবের ওপর আরবের শ্রেষ্ঠত্ব নেই; শ্রেষ্ঠত্বের মানদণ্ড হলো তাকওয়া। এই ঘোষণা পৃথিবীর সব ধরনের বর্ণবাদ, জাতিগত অহংকার ও শ্রেণিভেদের বিরুদ্ধে এক সুস্পষ্ট বার্তা। বর্তমান পৃথিবীতে গায়ের রং, ভাষা, জাতি বা বংশের কারণে বৈষম্য সৃষ্টি করা মানবতার পরিপন্থী। ইসলাম মানুষকে মর্যাদা দিয়েছে তার চরিত্র, নৈতিকতা ও আল্লাহভীতির ভিত্তিতে।

৩. অর্থনৈতিক ন্যায়নীতি ও সুদমুক্ত সমাজ: বিদায় হজ্জের ভাষণে রাসূলুল্লাহ ﷺ জাহিলিয়াতের সুদপ্রথা বাতিল ঘোষণা করেন। কারণ সুদ দরিদ্রকে শোষণ করে এবং সম্পদের অসম বণ্টন সৃষ্টি করে। ইসলাম এমন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চায় যেখানে প্রতারণা থাকবে না। শোষণ থাকবে না। সম্পদের সুসম বণ্টন হবে। দরিদ্র ও অসহায়দের অধিকার সংরক্ষিত হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন **لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ** তোমরা পরস্পরের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করো না। (সূরা আল-বাকার: ১৮৮) বর্তমান অর্থনৈতিক সংকট, ঋণের বোঝা ও বৈষম্যের যুগে বিদায় হজ্জের অর্থনৈতিক শিক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

৪. নারী অধিকার ও পারিবারিক শান্তি প্রতিষ্ঠা: বিদায় হজ্জের ভাষণে রাসূলুল্লাহ ﷺ নারীদের অধিকার রক্ষার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি বলেছেন তোমরা নারীদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো।

এর মাধ্যমে তিনি শিক্ষা দিয়েছেন, নারীর সম্মান রক্ষা করতে হবে। তাদের প্রতি সদ্যবহার করতে হবে। তাদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব পালন করতে হবে। পারিবারিক জীবনে ভালোবাসা ও সহযোগিতা বজায় রাখতে হবে। বর্তমান যুগে নারী নির্যাতন, পারিবারিক ভাঙন ও সম্পর্কের অবনতির মধ্যে রাসূল ﷺ-এর এই শিক্ষা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।

৫. মুসলিম ভ্রাতৃত্ব ও ঐক্যের শিক্ষা: বিদায় হজ্জের ভাষণ মুসলিম উম্মাহর ঐক্যের ভিত্তি স্থাপন করেছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘোষণা করেছেন যে, সকল মুসলমান পরস্পরের ভাই। আল্লাহ তাআলা বলেন **إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ** নিশ্চয়ই মুমিনগণ পরস্পর ভাই ভাই। (সূরা আল-হুজুরাত: ১০) এই ভ্রাতৃত্ব শুধু কথার বিষয় নয়; বরং একে অপরের সাহায্য করা, দুঃখ-কষ্টে পাশে দাঁড়ানো এবং পারস্পরিক সম্মান বজায় রাখার শিক্ষা দেয়।

৬. বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় বিদায় হজ্জের শিক্ষা: বিদায় হজ্জের ভাষণ শান্তি, নিরাপত্তা ও সহাবস্থানের শিক্ষা দেয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ এমন সমাজ গঠনের আহ্বান জানিয়েছেন যেখানে অন্যায়, প্রতারণা ও হিংসার পরিবর্তে ন্যায়, দয়া ও সহমর্মিতা থাকবে। বর্তমান বিশ্বে যুদ্ধ, সংঘাত ও হিংসা দূর করতে বিদায় হজ্জের মূলনীতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

৭. কুরআন ও সুন্নাহ অনুসরণের গুরুত্ব: রাসূলুল্লাহ ﷺ উম্মাতকে কুরআন ও তাঁর সুন্নাহ আঁকড়ে ধরার নির্দেশ দিয়েছেন। কারণ মানবজীবনের সকল ক্ষেত্রে সঠিক পথনির্দেশ পাওয়ার মূল উৎস হলো আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের আদর্শ। কুরআনে আল্লাহ বলেন **لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ** নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহর মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েছে উত্তম আদর্শ। (সূরা আল-আহযাব: ২১)

৮. বর্তমান মুসলিম সমাজের করণীয়: বিদায় হজ্জের শিক্ষা বাস্তবায়নের জন্য মুসলমানদের উচিত ১. কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করা। ২. অন্যায়, দুর্নীতি ও প্রতারণা থেকে বিরত থাকা। ৩. মানুষের অধিকার রক্ষা করা। ৪. পরিবারে শান্তি ও ভালোবাসার পরিবেশ তৈরি করা। ৫. জাতি, বর্ণ ও শ্রেণিগত অহংকার পরিহার করা। ৬. সমাজে ন্যায়বিচার ও

কল্যাণ প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখা। ৭. জ্ঞান, নৈতিকতা ও মানবসেবায় এগিয়ে আসা।

১. বিদায় হজ্জের ভাষণ ইসলামের সার্বজনীন মানবিক নীতিমালার সংক্ষিপ্ত রূপ। ২. মানুষের জীবন, সম্পদ ও সম্মান ইসলামে অত্যন্ত পবিত্র। ৩. সুদ, অন্যায় শোষণ ও জাহিলিয়াতের কুসংস্কার ইসলাম সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত করেছে। ৪. ইসলাম নারীকে সম্মান, অধিকার ও নিরাপত্তা প্রদান করেছে। ৫. জাতি, বর্ণ ও ভাষার উর্ধ্বে তাকওয়াকেই শ্রেষ্ঠত্বের মানদণ্ড নির্ধারণ করা হয়েছে। ৬. কুরআন ও সুন্নাহ অনুসরণই দুনিয়া ও আখিরাতের সফলতার একমাত্র পথ। ৭. বিদায় হজ্জের ভাষণ মানবতার জন্য একটি সার্বজনীন নির্দেশনা। ৮. ইসলাম জীবন, সম্পদ ও সম্মানের নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছে। ৯. সামাজিক ন্যায়বিচার ও সাম্য ইসলামের অন্যতম মৌলিক শিক্ষা। ১০. নারী ও দুর্বল শ্রেণির অধিকার রক্ষা ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ। ১১. অর্থনৈতিক শোষণ ও অন্যায় লেনদেন ইসলাম সমর্থন করে না। ১২. কুরআন ও সুন্নাহ অনুসরণ করলে ব্যক্তি ও সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।

বিদায় হজ্জের ভাষণ শুধু মুসলমানদের জন্য নয়, সমগ্র মানবজাতির জন্য একটি চিরন্তন জীবনদর্শন। এতে মানবাধিকার, সামাজিক ন্যায়বিচার, অর্থনৈতিক ভারসাম্য, নারী অধিকার, সাম্য, ভ্রাতৃত্ব এবং আল্লাহভীতির যে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, তা আজও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। বর্তমান বিশ্বে যখন যুদ্ধ, বৈষম্য, অর্থনৈতিক শোষণ, পারিবারিক সংকট ও মানবাধিকার লঙ্ঘন বৃদ্ধি পাচ্ছে, তখন বিদায় হজ্জের ভাষণের শিক্ষাগুলো বাস্তবায়ন করলে ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রে শান্তি, ন্যায়বিচার এবং পারস্পরিক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। বিদায় হজ্জের ভাষণ মানবসভ্যতার ইতিহাসে এক অনন্য দলিল। এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ মানবজাতিকে শান্তি, ন্যায়, সাম্য, ভ্রাতৃত্ব ও নৈতিকতার পথে আহ্বান করেছেন। এই ভাষণের প্রতিটি শিক্ষা ব্যক্তি জীবন থেকে গুরু করে আন্তর্জাতিক সমাজ পর্যন্ত প্রয়োগযোগ্য। আজকের পৃথিবীতে যদি মানুষ বিদায় হজ্জের ভাষণের মূলনীতি ন্যায়বিচার, মানবিকতা, পারস্পরিক সম্মান, অর্থনৈতিক ভারসাম্য ও নৈতিকতা অনুসরণ করে, তাহলে একটি শান্তিপূর্ণ ও কল্যাণময় সমাজ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। সুতরাং বিদায় হজ্জের ভাষণ শুধু একটি ঐতিহাসিক ভাষণ নয়; এটি মানবতার জন্য আলোকবর্তিকা, যা যুগে যুগে মানুষকে সত্য, ন্যায় ও শান্তির পথ দেখাবে।

লেখক: সাবেক মহাপরিচালক, আল্ জামিয়াতুল ইসলামিয়া, পটিয়া,
চট্টগ্রাম।

আওলিয়া কেরামের পরিচয় ও দ্বীন ইসলামের সংস্কারে

মুজাদ্দিদে আলফে সানী (রহ.)-এর অবদান

আলহাজ্জ মাওলানা আজিজুল হক আল-মাদানী

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ ও চিরন্তন জীবনব্যবস্থা, যা মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং আধ্যাত্মিক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা প্রদান করেছে। এই মহান দ্বীনের মূল ভিত্তি হলো কুরআনুল কারিম এবং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সুন্নাহ। ইতিহাসের প্রতিটি যুগে এমন কিছু আল্লাহভীরু, জ্ঞানী ও পরহেজগার ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব ঘটেছে, যারা কুরআন-সুন্নাহর আলোকে মানুষের ঈমান, আমল ও চরিত্রকে সংশোধনের জন্য নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। ইসলামী পরিভাষায় এঁদেরকে আওলিয়া কেরাম বলা হয়। তাঁরা নবী নন; বরং নবীদের রেখে যাওয়া ইলম, তাকওয়া ও নৈতিক আদর্শের প্রকৃত উত্তরাধিকারী হিসেবে সমাজে দ্বীনের শিক্ষা প্রচার, আত্মশুদ্ধি এবং নৈতিক উৎকর্ষ সাধনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। আওলিয়া কেরামের মর্যাদা সম্পর্কে কুরআনুল কারিম ও সহিহ হাদিসে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা তাঁদেরকে নিজের বন্ধু (ওলী) হিসেবে অভিহিত করেছেন এবং ঘোষণা করেছেন যে, তাঁদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে কোনো ভয় বা দুঃখ নেই। তাঁদের জীবনের মূল বৈশিষ্ট্য ছিল বিশুদ্ধ ঈমান, গভীর তাকওয়া, ইখলাস, সুন্নাহর অনুসরণ, আত্মসংযম এবং মানুষের কল্যাণে আত্মনিয়োগ। তাঁরা কখনো শরিয়তের বাইরে কোনো পথ অবলম্বন করেননি; বরং শরিয়তের যথাযথ অনুসরণকেই প্রকৃত আধ্যাত্মিকতার ভিত্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাঁদের চরিত্র, ইবাদত, জ্ঞান ও প্রজ্ঞা যুগে যুগে মুসলিম সমাজকে সত্যের পথে পরিচালিত করেছে এবং ইসলামের সুমহান আদর্শকে জীবন্ত রেখেছে।

ইসলামের ইতিহাসে অসংখ্য আওলিয়া কেরাম মানবতার কল্যাণে অসামান্য অবদান রেখেছেন। তাঁদের মধ্যে হযরত ইমাম রব্বানী শাইখ আহমদ সিরহিন্দী (রহ.) সর্বাধিক প্রভাবশালী সংস্কারকদের একজন। তিনি মুজাদ্দিদে আলফে সানী বা “দ্বিতীয় সহস্রাব্দের সংস্কারক” নামে বিশ্বজুড়ে সমধিক পরিচিত। হিজরি দ্বিতীয় সহস্রাব্দের সূচনালগ্নে তিনি এমন এক সময়ে আবির্ভূত হন, যখন মুসলিম সমাজ আকীদাগত বিভ্রান্তি, বিদআত, শরিয়তবিমুখতা এবং রাজনৈতিক প্রভাবের কারণে ইসলামের বিশুদ্ধ শিক্ষা থেকে বিচ্যুত হওয়ার ঝুঁকিতে ছিল। বিশেষত মুঘল সম্রাট আকবরের প্রবর্তিত দীন-ই ইলাহী এবং ধর্মীয় সমন্বয়বাদের প্রভাবে ইসলামের মৌলিক আকীদা ও শরিয়তের অবস্থান দুর্বল হয়ে পড়ছিল। এই সংকটময় সময়ে ইমাম রব্বানী (রহ.) কুরআন ও সুন্নাহকে সামনে রেখে দ্বীনের বিশুদ্ধ রূপ পুনঃপ্রতিষ্ঠার আন্দোলন শুরু করেন।

তাঁর দাওয়াতের মূল লক্ষ্য ছিল মুসলিম সমাজকে শিরক, বিদআত, কুসংস্কার ও ভ্রান্ত মতবাদ থেকে মুক্ত করে বিশুদ্ধ তাওহিদ, সুন্নাহ এবং শরিয়তের অনুসরণে ফিরিয়ে আনা। তিনি তাসাউফকে কুরআন ও সুন্নাহর সীমার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করেন যে, প্রকৃত আধ্যাত্মিকতা কখনো শরিয়ত থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারে না। তাঁর অমর গ্রন্থ ‘মাকতুবাতে ইমাম রব্বানী’ ইসলামী আকীদা, তাসাউফ, আত্মশুদ্ধি, ইখলাস এবং শরিয়তের গুরুত্ব সম্পর্কে এক অমূল্য দিকনির্দেশনা হিসেবে আজও সমাদৃত।

এই প্রবন্ধে প্রথমে কুরআন ও হাদিসের আলোকে আওলিয়া কেরামের মর্যাদা, বৈশিষ্ট্য ও ইসলামে তাঁদের অবস্থান আলোচনা করা হবে। পাশাপাশি মুজাদ্দিদে আলফে সানী (রহ.)-এর সংক্ষিপ্ত জীবন, শিক্ষা ও ব্যক্তিত্ব তুলে ধরা হবে। পরবর্তী অংশে তাঁর যুগের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় প্রেক্ষাপট, ইসলামের সংস্কারে তাঁর ঐতিহাসিক অবদান, দীন-ই ইলাহির বিরুদ্ধে তাঁর দৃঢ় অবস্থান, তাসাউফের বিশুদ্ধ রূপ প্রতিষ্ঠায় তাঁর ভূমিকা, মাকতুবাতে ইমাম রব্বানী-এর গুরুত্ব এবং মুসলিম সমাজে তাঁর সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিশদভাবে আলোচিত হবে। এর মাধ্যমে স্পষ্ট হবে যে, প্রকৃত সংস্কার কখনো নতুন ধর্মীয় ধারা সৃষ্টি নয়; বরং কুরআন ও সহিহ সুন্নাহর বিশুদ্ধ শিক্ষাকে পুনর্জাগরিত করাই একজন মুজাদ্দিদের মূল দায়িত্ব।

আওলিয়া শব্দের অর্থ ও পরিচয়: ওলী (ولي) শব্দটি আরবি ولاية (ওয়ালায়াহ) ধাতু থেকে এসেছে। এর অর্থ নিকটবর্তী হওয়া, বন্ধু,

সাহায্যকারী, অভিভাবক বা প্রিয়জন। ইসলামী পরিভাষায় ওলী বলতে সেই ব্যক্তিকে বোঝায়, যিনি ঈমান, তাকওয়া, ইখলাস, ইবাদত এবং আনুগত্যের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করেছেন। আওলিয়া কেরাম কখনো নিজেদের বিশেষ মর্যাদার দাবি করেন না; বরং তাঁরা আল্লাহর বিনয়ী বান্দা হিসেবে জীবনযাপন করেন এবং মানুষকে কুরআন ও সুন্নাহর পথে আহ্বান করেন।

কুরআনে আওলিয়া কেরামের মর্যাদা: আল্লাহ তাআলা বলেন **أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَفْقَهُونَ** জেনে রাখো! নিশ্চয়ই আল্লাহর বন্ধুদের কোনো ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না। তারা হলো সেইসব লোক, যারা ঈমান এনেছে এবং তাকওয়া অবলম্বন করেছে। (সূরা ইউনুস: ৬২-৬৩) এই আয়াতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, আল্লাহর ওলী হওয়ার মূল ভিত্তি হলো বিশুদ্ধ ঈমান ও তাকওয়া। অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি বংশ, জাতি বা অলৌকিক ঘটনার কারণে ওলী হন না; বরং ঈমান ও তাকওয়ার কারণেই আল্লাহর নৈকট্য লাভ করেন।

হাদিসে আওলিয়া কেরামের মর্যাদা: রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি হাদিসে কুদসিতে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ তাআলা বলেন যে ব্যক্তি আমার কোনো ওলীর সঙ্গে শত্রুতা করবে, আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করি। আমার বান্দা ফরজ ইবাদতের মাধ্যমে আমার নিকটবর্তী হয়; এরপর নফল ইবাদতের মাধ্যমে আরও নিকটবর্তী হতে থাকে। অবশেষে আমি তাকে ভালোবাসি। (সহিহ বুখারি) এই হাদিস থেকে বোঝা যায় যে, আল্লাহর ওলী হওয়ার পথ হলো ফরজ ইবাদতের যথাযথ পালন, নফল ইবাদতের প্রতি যত্ন এবং সর্বক্ষেত্রে আল্লাহর আনুগত্য।

আওলিয়া কেরামের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো হলো ১. বিশুদ্ধ ঈমান তাঁদের আকীদা কুরআন ও সহিহ সুন্নাহভিত্তিক হয়। তাঁরা শিরক, কুফর ও বিদআত থেকে দূরে থাকেন। ২. তাকওয়া তাঁরা প্রকাশ্যে ও গোপনে সর্বদা আল্লাহকে ভয় করেন এবং তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা করেন। ৩. সুন্নাহর অনুসরণ তাঁদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আদর্শ অনুসরণের চেষ্টা থাকে। ৪. ইখলাস তাঁদের সকল আমল একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হয়; লোকদেখানো বা খ্যাতিলাভ তাঁদের উদ্দেশ্য নয়। ৫. বিনয় ও উত্তম চরিত্র আওলিয়া কেরাম অহংকারমুক্ত, দয়ালু, ক্ষমাশীল ও মানবসেবায় নিবেদিত থাকেন।

কারামাত সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি: আওলিয়া কেরামের মাধ্যমে আল্লাহর ইচ্ছায় যে অলৌকিক ঘটনা প্রকাশ পায়, তাকে কারামাত বলা হয়। ইসলামের আকীদা অনুযায়ী কারামাত সত্য। এটি আল্লাহর ক্ষমতায় সংঘটিত হয়। ওলী নিজস্ব ক্ষমতায় কারামাত প্রদর্শন করেন না। কারামাত কোনো ব্যক্তির শ্রেষ্ঠত্বের একমাত্র মানদণ্ড নয়; বরং প্রকৃত মর্যাদা তাকওয়া ও সুন্নাহর অনুসরণে। তাই কারামাতের প্রতি অযথা বাড়াবাড়ি বা কুসংস্কারে জড়িয়ে পড়া ইসলামের শিক্ষা নয়।

ইসলামী সমাজে আওলিয়া কেরামের অবদান: ইসলামের ইতিহাসে আওলিয়া কেরাম বহু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। তাঁদের অবদানের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কুরআন ও সুন্নাহর শিক্ষা প্রচার। ইসলামী নৈতিকতা ও চরিত্র গঠন। তাসাউফের মাধ্যমে আত্মশুদ্ধির শিক্ষা। দ্বীনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের মোকাবিলা। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও খানকাহ প্রতিষ্ঠা। সমাজে শান্তি, ভ্রাতৃত্ব ও মানবসেবার প্রসার। ভারতীয় উপমহাদেশে হযরত খাজা মইনুদ্দীন চিশতী (রহ.), হযরত শাহ জালাল (রহ.), হযরত খান জাহান আলী (রহ.) প্রমুখ আওলিয়া ইসলাম প্রচার ও সমাজ সংস্কারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।

ইসলামে মুজাদ্দিদ (সংস্কারক)-এর ধারণা: মুজাদ্দিদ শব্দের অর্থ-সংস্কারক বা নবায়নকারী। ইসলামের ইতিহাসে এমন ব্যক্তিকে মুজাদ্দিদ বলা হয়, যিনি কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে সমাজে প্রচলিত ভ্রান্তি, কুসংস্কার ও বিদআত দূর করে দ্বীনের বিশুদ্ধ শিক্ষা পুনরুজ্জীবিত করেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন নিশ্চয়ই আল্লাহ এই উম্মতের জন্য প্রতি একশ বছর শেষে এমন একজনকে প্রেরণ করবেন, যিনি তাদের দ্বীনকে নবায়ন (সংস্কার) করবেন। (সুনান আবু দাউদ) এই হাদিস থেকেই ইসলামে তাজদীদ (সংস্কার) ধারণার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

মুজাদ্দিদে আলফে সানী (রহ.)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী: মুজাদ্দিদে আলফে সানী (রহ.)-এর প্রকৃত নাম শাইখ আহমদ আল-ফারুকী আস-সিরহিন্দী (রহ.)। তিনি ৯৭১ হিজরি (১৫৬৪ খ্রিস্টাব্দে) ভারতের পাঞ্জাবের সিরহিন্দ শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বংশধারা দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.)-এর সঙ্গে সম্পর্কিত বলে উল্লেখ করা হয়। এ কারণে তাঁকে আল-ফারুকী বলা হয়। তাঁর পিতা শাইখ আবদুল আহাদ (রহ.) ছিলেন একজন বিশিষ্ট আলেম ও বুয়ুর্গ। শৈশব থেকেই তিনি কুরআন, হাদিস, তাফসির, ফিকহ, আকীদা, আরবি সাহিত্য ও তাসাউফে উচ্চশিক্ষা লাভ করেন। পরে

তিনি নকশবন্দিয়া তরিকার সঙ্গে যুক্ত হন এবং আত্মশুদ্ধি ও শরিয়তভিত্তিক তাসাউফের শিক্ষা বিস্তারে আত্মনিয়োগ করেন।

কেন তাঁকে ‘মুজাদ্দিদে আলফে সানী’ বলা হয়? আলফে সানী’ অর্থ দ্বিতীয় সহস্রাব্দ। হিজরি দ্বিতীয় সহস্রাব্দের সূচনালগ্নে তিনি ইসলামের আকীদা, শরিয়ত ও সুন্নাহকে পুনরুজ্জীবিত করার অসাধারণ ভূমিকা পালন করেন। এজন্য সমকালীন ও পরবর্তী যুগের বহু আলেম তাঁকে মুজাদ্দিদে আলফে সানী” (দ্বিতীয় সহস্রাব্দের সংস্কারক) উপাধিতে ভূষিত করেছেন।

তাঁর সংস্কার আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা: মুজাদ্দিদে আলফে সানী (রহ.)-এর যুগে মুঘল সম্রাট আকবরের শাসনামলে বিভিন্ন দ্রাব্য মতবাদ, ধর্মীয় উদারবাদের নামে আকীদাগত বিভ্রান্তি এবং দীন-ই ইলাহী-র মতো মতাদর্শ প্রচারিত হচ্ছিল। অনেক মুসলমান শরিয়ত ও সুন্নাহ থেকে দূরে সরে যাচ্ছিল।

এই সংকটময় সময়ে তিনি কুরআন-সুন্নাহভিত্তিক ইসলামের বিশুদ্ধ শিক্ষা প্রতিষ্ঠার আন্দোলন শুরু করেন এবং মুসলিম সমাজকে দ্রাব্য বিশ্বাস ও বিদআত থেকে রক্ষা করার জন্য নিরলস প্রচেষ্টা চালান।

আওলিয়া কেরামের প্রকৃত পরিচয় হলো -ঈমান, তাকওয়া ও সুন্নাহর অনুসরণ। আল্লাহর ওলী হওয়ার জন্য অলৌকিক ক্ষমতা নয়; বরং বিশুদ্ধ ঈমান ও সংকর্ম অপরিহার্য। ইসলামে কারামাত সত্য, তবে তা কখনো শরিয়তের উর্ধ্বে নয়। যুগে যুগে আল্লাহ তাআলা মুজাদ্দিদদের মাধ্যমে দ্বীনের বিশুদ্ধ শিক্ষা পুনরুজ্জীবিত করেছেন। মুজাদ্দিদে আলফে সানী (রহ.) ইসলামের ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংস্কারক।

মুজাদ্দিদে আলফে সানী (রহ.)-এর যুগের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় প্রেক্ষাপট: ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে ভারতবর্ষে মুঘল সাম্রাজ্যের শাসন চলছিল। সম্রাট আকবর রাজনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে সমন্বয়ের নীতি গ্রহণ করেন। এই নীতির অংশ হিসেবে তিনি এমন একটি মতবাদ প্রচলনের চেষ্টা করেন, যা ইসলামের স্বতন্ত্র আকীদা ও শরিয়তের সঙ্গে সাংঘর্ষিক ছিল। এ সময় অনেক মুসলমান ইসলামের মৌলিক শিক্ষা থেকে দূরে সরে যেতে শুরু করেন এবং বিদআত ও কুসংস্কারের বিস্তার ঘটে।

এই সংকটময় পরিস্থিতিতে মুজাদ্দিদে আলফে সানী (রহ.) দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করেন যে, ইসলামের আকীদা, ইবাদত ও শরিয়ত আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত; এগুলোর সঙ্গে অন্য কোনো ধর্মীয় বিশ্বাসের আপস বা

সংমিশ্রণ গ্রহণযোগ্য নয়। তাঁর সংস্কার আন্দোলনের মূল লক্ষ্য ছিল মুসলিম সমাজকে কুরআন ও সুন্নাহর বিশুদ্ধ শিক্ষায় ফিরিয়ে আনা।

দীন-ই ইলাহির মোকাবিলায় তাঁর ভূমিকা: সম্রাট আকবরের আমলে প্রচলিত দীন-ই ইলাহী ছিল বিভিন্ন ধর্মীয় উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত একটি মতবাদ। বহু আলেম এই মতবাদের বিরোধিতা করলেও মুজাদ্দিদে আলফে সানী (রহ.) যুক্তি, ইলম ও আধ্যাত্মিক প্রভাবের মাধ্যমে এর বিরুদ্ধে সুসংগঠিত প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। তিনি স্পষ্টভাবে তুলে ধরেন ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ ও পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা। কুরআন ও সুন্নাহই একমাত্র নির্ভরযোগ্য জীবনবিধান। আল্লাহর দ্বীনের সঙ্গে অন্য কোনো ধর্মীয় দর্শনের সংমিশ্রণ বৈধ নয়। মুসলমানের পরিচয় ও ঈমান রক্ষার জন্য শরিয়তের অনুসরণ অপরিহার্য। তাঁর প্রচেষ্টা এবং আলেম সমাজের সহযোগিতায় পরবর্তী সময়ে দীন-ই ইলাহির প্রভাব ক্ষীণ হয়ে পড়ে এবং ইসলামের স্বকীয়তা পুনরায় সুদৃঢ় হয়।

আকীদা ও সুন্নাহ প্রতিষ্ঠায় তাঁর অবদান: মুজাদ্দিদে আলফে সানী (রহ.) বিশ্বাস করতেন যে, ইসলামের মূল শক্তি নিহিত রয়েছে বিশুদ্ধ আকীদা এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাহ অনুসরণে। তিনি বলেন, শরিয়ত থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো আধ্যাত্মিক সাধনা গ্রহণযোগ্য নয়। তাঁর সংস্কার আন্দোলনের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল, কুরআন ও সহিহ সুন্নাহর অনুসরণের ওপর জোর প্রদান। বিদআত, কুসংস্কার ও অন্ধ অনুকরণের বিরোধিতা। ফরজ ও ওয়াজিব ইবাদতের গুরুত্ব তুলে ধরা। সুন্নাহর পুনর্জাগরণ এবং শরিয়তভিত্তিক জীবন গঠনের আহ্বান। ইসলামী আকীদাকে শিরক ও বিভ্রান্তি থেকে রক্ষা করা। তিনি জোর দিয়ে বলেন, যে তাসাউফ শরিয়তের অনুসারী নয়, তা গ্রহণযোগ্য নয়।

তাসাউফের সংস্কারে তাঁর অবদান: মুজাদ্দিদে আলফে সানী (রহ.) তাসাউফকে ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ আত্মশুদ্ধিমূলক শিক্ষা হিসেবে গ্রহণ করলেও তিনি এর মধ্যে প্রবেশ করা অতিরঞ্জন, কুসংস্কার ও শরিয়তবিরোধী ধারণার সংশোধন করেন। তিনি শিক্ষা দেন তাসাউফের মূল উদ্দেশ্য হলো আত্মশুদ্ধি (তায়কিয়াতুন নফস)। শরিয়ত, তরীকত, হাকীকত ও মারিফত-এগুলো পরস্পরবিরোধী নয়; বরং একে অপরের পরিপূরক। কোনো কাশফ, ইলহাম বা আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা কুরআন ও সুন্নাহর বিরোধী হলে তা গ্রহণযোগ্য নয়। প্রকৃত ওলী সর্বদা শরিয়তের

অনুসারী হন। এই শিক্ষা ইসলামী তাসাউফকে সঠিক ধারায় ফিরিয়ে আনতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

মাকতুবাতে ইমাম রব্বানীএর গুরুত্ব: মুজাদ্দিদে আলফে সানী (রহ.)-এর সর্বাধিক প্রসিদ্ধ রচনা হলো মাকতুবাতে ইমাম রব্বানী। এটি তাঁর লিখিত বিভিন্ন চিঠির সংকলন, যা তিনি সমকালীন আলেম, শাসক, সুফি, ছাত্র এবং সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে লিখেছিলেন। এই গ্রন্থে তিনি আলোচনা করেছেন, ইসলামী আকীদা, তাওহিদ, সুন্নাহর গুরুত্ব, শরিয়তের অনুসরণ, আত্মশুদ্ধি, তাসাউফের সঠিক ব্যাখ্যা, বিদআতের ক্ষতি, শাসক ও আলেমদের দায়িত্ব, মাকতুবাতে আজও ইসলামী চিন্তাধারার অন্যতম মূল্যবান গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত এবং বহু মাদরাসা ও উচ্চতর ইসলামী শিক্ষাক্রমে এটি অধ্যয়ন করা হয়।

শাসক ও আলেমদের প্রতি তাঁর দিকনির্দেশনা : মুজাদ্দিদে আলফে সানী (রহ.) মনে করতেন যে, সমাজ সংস্কারের জন্য আলেম ও শাসক-উভয়েরই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তিনি শাসকদের উপদেশ দিয়েছেন শরিয়তভিত্তিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে। ইসলামী শিক্ষা প্রসার করতে। বিদআত ও অন্যায় দমন করতে। আলেমদের সম্মান করতে। জনগণের অধিকার রক্ষা করতে। আবার আলেমদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন ইলমের সঙ্গে আমল যুক্ত করতে হবে। সত্য কথা বলতে ভয় পাওয়া যাবে না। কুরআন ও সুন্নাহর বিশুদ্ধ শিক্ষা মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে হবে।

পরবর্তী ইসলামী সংস্কার আন্দোলনে তাঁর প্রভাব: মুজাদ্দিদে আলফে সানী (রহ.)-এর সংস্কার আন্দোলন ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলিম সমাজে গভীর প্রভাব বিস্তার করে। তাঁর চিন্তাধারা পরবর্তীকালে বহু আলেম, মাদরাসা ও ইসলামী সংস্কার আন্দোলনের ওপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। তাঁর অবদানের ফলে আকীদাগত বিভ্রান্তি হ্রাস পায়। সুন্নাহর অনুসরণের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। শরিয়তভিত্তিক তাসাউফ শক্তিশালী হয়। ইসলামী শিক্ষাচর্চা নতুন গতি লাভ করে। মুসলিম সমাজে আত্মপরিচয় ও ধর্মীয় চেতনা জাগ্রত হয়।

সমকালীন মুসলিম সমাজের জন্য তাঁর শিক্ষা: বর্তমান যুগেও মুজাদ্দিদে আলফে সানী (রহ.)-এর শিক্ষা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। আজকের মুসলিম সমাজ তাঁর জীবন থেকে যে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে ১. কুরআন ও সুন্নাহকে জীবনের সর্বোচ্চ মানদণ্ড হিসেবে গ্রহণ করা। ২. বিদআত, কুসংস্কার ও আকীদাগত বিভ্রান্তি থেকে দূরে থাকা। ৩. শরিয়ত ও তাসাউফের মধ্যে

সঠিক ভারসাম্য রক্ষা করা। ৪. ইলম, আমল ও আখলাকের সমন্বয়ে ব্যক্তিত্ব গঠন করা। ৫. ইসলামের মৌলিক আদর্শ রক্ষায় সাহসিকতা ও প্রজ্ঞার পরিচয় দেওয়া। আওলিয়া কেরামের প্রকৃত মর্যাদা তাঁদের ঈমান, তাকওয়া ও সুন্নাহর অনুসরণে। মুজাদ্দিদে আলফে সানী (রহ.) ইসলামের বিশুদ্ধ আকীদা সংরক্ষণে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছেন। শরিয়ত থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো আধ্যাত্মিক সাধনা ইসলামে গ্রহণযোগ্য নয়। সমাজ সংস্কারের জন্য ইলম, আমল, তাকওয়া ও সাহস-এই চারটি গুণ অপরিহার্য। ইসলামের স্বকীয়তা রক্ষা এবং বিদআত প্রতিরোধে তাঁর চিন্তাধারা আজও প্রাসঙ্গিক।

উপসংহার: পরিশেষে বলা যায়, আওলিয়া কেরাম ইসলামের ইতিহাসে এমন এক মহৎ শ্রেণির মানুষ, যাদের জীবন ছিল কুরআন ও সুন্নাহর বাস্তব প্রতিচ্ছবি। তাঁরা নিজেদের চরিত্র, ইবাদত, তাকওয়া, ইখলাস এবং আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে শুধু ব্যক্তিগতভাবে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করেননি; বরং সমাজকে নৈতিকতা, মানবিকতা এবং বিশুদ্ধ দ্বীনের পথে পরিচালিত করেছেন। তাঁদের দাওয়াত ছিল ভালোবাসা, প্রজ্ঞা, সহনশীলতা এবং আন্তরিকতার ওপর প্রতিষ্ঠিত। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, বহু অঞ্চলে ইসলামের প্রসারে আওলিয়া কেরামের অবদান ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাঁরা মানুষের হৃদয় জয় করেছেন চরিত্রের সৌন্দর্য, উত্তম আচরণ এবং আল্লাহর সম্ভ্রুতি অর্জনের নিরলস প্রচেষ্টার মাধ্যমে।

এই মহান ধারার অন্যতম উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব হলেন মুজাদ্দিদে আলফে সানী হযরত ইমাম রব্বানী শায়খ আহমদ সিরহিন্দী (রহ.)। তিনি এমন এক সময়ে ইসলামের পুনর্জাগরণের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন, যখন আকীদাগত বিভ্রান্তি, বিদআত, শরিয়তবিমুখতা এবং বিভিন্ন ভ্রান্ত দর্শনের প্রভাবে মুসলিম সমাজ গভীর সংকটের সম্মুখীন হচ্ছিল। তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করেন যে, প্রকৃত আধ্যাত্মিকতা কখনোই শরিয়তের বাইরে হতে পারে না। তাঁর মতে, কুরআন ও সুন্নাহর অনুসরণ ব্যতীত তাসাউফের কোনো মূল্য নেই। তাই তিনি আত্মশুদ্ধি ও ইহসানের শিক্ষাকে শরিয়তের পূর্ণ আনুগত্যের সঙ্গে একীভূত করে ইসলামের প্রকৃত রূপ তুলে ধরেন।

মুজাদ্দিদে আলফে সানী (রহ.)-এর রচিত মাকতুবাতে ইমাম রব্বানী শুধু তাসাউফ বিষয়ক একটি গ্রন্থ নয়; বরং এটি আকীদা, ইবাদত, আত্মশুদ্ধি, সুন্নাহর অনুসরণ এবং মুসলিম সমাজ সংস্কারের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা। তাঁর চিন্তাধারা পরবর্তী যুগের অসংখ্য আলেম, বুয়ুর্গ ও

সংস্কারকের ওপর গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে। তিনি প্রমাণ করেছেন যে, ইসলামের প্রকৃত সংস্কার মানে নতুন মতবাদ সৃষ্টি করা নয়; বরং কুরআন ও সুন্নাহর বিশুদ্ধ শিক্ষাকে মানুষের জীবনে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা।

বর্তমান যুগেও মুসলিম সমাজ নানামুখী চ্যালেঞ্জ, বিভ্রান্তি, নৈতিক অবক্ষয় এবং ধর্মীয় উদাসীনতার সম্মুখীন। এ পরিস্থিতিতে আওলিয়া কেরামের ইখলাস, তাকওয়া, আল্লাহভীতি, মানবপ্রেম এবং মুজাদ্দিদে আলফে সানী (রহ.)-এর কুরআন-সুন্নাহভিত্তিক সংস্কার আন্দোলন আমাদের জন্য অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। ব্যক্তি ও সমাজজীবনে ইসলামের বিশুদ্ধ আদর্শ প্রতিষ্ঠা করতে হলে আত্মশুদ্ধির পাশাপাশি বিশুদ্ধ আকীদা, সহিহ আমল এবং সুন্নাহর প্রতি অবিচল আনুগত্য গড়ে তুলতে হবে। একই সঙ্গে বিদআত, কুসংস্কার, গোঁড়ামি ও ধর্মের নামে প্রচলিত ভ্রান্ত বিশ্বাস থেকে নিজেদের রক্ষা করতে হবে।

অতএব, আমাদের কর্তব্য হলো আওলিয়া কেরামের প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করা, তাঁদের জীবন থেকে তাকওয়া, ইখলাস, বিনয়, আত্মসংযম ও মানবসেবার শিক্ষা গ্রহণ করা এবং মুজাদ্দিদে আলফে সানী (রহ.)-এর প্রদর্শিত সংস্কারের পথ অনুসরণ করে কুরআন ও সহিহ সুন্নাহকে জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করা। এভাবেই ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজে বিশুদ্ধ ইসলামের আলো বিকশিত হবে এবং মুসলিম উম্মাহ সত্যিকার অর্থে নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও সভ্যতার পুনর্জাগরণের পথে অগ্রসর হতে সক্ষম হবে। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে কুরআন ও সুন্নাহর ওপর অবিচল থাকার, নেককারদের আদর্শ অনুসরণ করার এবং বিশুদ্ধ ঈমান ও আমলের সঙ্গে জীবন অতিবাহিত করার তাওফিক দান করুন। আমীন।

লেখক: ইসলামী গবেষক ও চিন্তাবিদ,

১৯ দিন ব্যাপী ৪৯ তম মাহফিলে মাহফিলে সীরতুননবী (সঃ) ২০১৯ ইং ১৭ দিবসের আলোচনা।

নবীজি (সা.)-এর অনুসরণেই মুক্তি
আবু সালেহ মুহাম্মদ ছলীমুল্লাহ

মুক্তি আসবে নবীজি (সা.)-এর অনুসরণে
দো'জাহানের তিনি অব্যাহত রহমত
নাহলে তো সৃষ্টি হতো না কিছুই
মানব-দানব, রবি-শশীও সৃষ্টি জগত ॥

প্রিয় নবী, সাইয়েদুল আশিয়া হযরত মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্হি ওয়াসাল্লাম ধরার বুকে তাশরিফ আনলেন। নবী হিসেবেই ছিলো তাঁর শুভাগমন। ৫৭০ খ্রিস্টাব্দের হজ্জিবর্ষে ১২ রবিউল আউয়াল সোমবার পবিত্র মক্কা মুকাররমায় কুরাইশ বংশে সুবহে সাদিকের সময় তাঁর আবির্ভাব। বিবি আমিনা (রা.)-এর গৃহসহ সমগ্র জগত সে মুহূর্তে পুলকিত ও আলোকিত। তিমিরাচ্ছন্ন পৃথিবী, দিকভ্রান্ত জাতি ও জাহেরী সমাজকে প্রোজ্জ্বল করতেই তাঁর আত্মপ্রকাশ। তিনি সিরাজুন্ মুনীরা-উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা। সকল পথ, নির্দেশিত, ধর্ম ও মতাদর্শের উপর ইসলামের সুমহান আদর্শকে বিজয় করাই ছিলো তার শুভাগমনের মূল উদ্দেশ্য। বিজয়ের ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে জনপদসমূহে আল্লাহর বাণী প্রচার, পরিচ্ছন্ন ও হৃদয়বান নাগরিক তৈরি, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রজ্ঞাময় পূর্ণ মানব সম্পদ গড়ে তোলার নবুওয়াতি মিশন নিয়ে তিনি সদা তৎপর থাকতেন। হাজারো নির্যাতন, নিপীড়ন, জুলুম ও বাধার পাহাড় মাড়িয়ে অবশেষে মদিনা-আল মুনাওয়ারায় সে কাঙ্ক্ষিত সমাজ সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। ঐতিহাসিক মক্কা বিজয়সহ বিশ্বময় ফত্বে মুবিনের (সুস্পষ্ট বিজয়ের) কেতন উড়িয়ে পরিপূর্ণ দ্বীন আল ইসলাম সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

মহান মিশন সফল করে ধরার বুকে তাঁর ৬৩ বছর অতিবাহিত হয়েছে। পুরো জীবনের সামগ্রিক সকল কর্ম সবশ্রেণির মানবতার জন্য অনুসরণীয়। তিনি শিশু-কিশোর, যুবক, নবীন ও প্রবীণ নির্বিশেষে সকল শ্রেণির ও পেশার মানুষের জন্য সর্বোত্তম আদর্শ। তাঁর অনুসরণের মাঝেই নিহিত রয়েছে উভয় জাহানের মুক্তি ও কল্যাণ। ব্যক্তি, পরিবার, রাষ্ট্র এবং

আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে সুখ-সমৃদ্ধি, শান্তি ও নিরাপত্তা বিধানের তাঁর আদর্শের বিকল্প নেই।

২. যখন থেকে তিনি নবী :

এ ধারণা সর্বস্তরে প্রচলিত যে, তিনি চল্লিশ বছর বয়সে নবুওয়াত লাভ করেন। অথচ এর পূর্ব থেকে তিনি নবী। নবী হিসেবেই তিনি ধরার বুকে তাশরীফ এনেছেন। কখন থেকে তবে তার নবুওয়াত শুরু হলো?

এ প্রসঙ্গে- হাদিস শরীফ এসেছে, হযরত আবু হুরায়রা (রা.) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন :

قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَتَى وَجَبَتْ لَكَ النُّبُوَّةُ قَالَ وَأَدُمُ يَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ
লোকেরা জানতে চাইলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার নবুওয়াত কখন অবধারিত হয়েছে? তিনি বললেন, যখন আদম (আ.) তার দেহ এবং আত্মার মধ্যে ছিল, অর্থাৎ যখন আদম (আ.)-এর সৃষ্টির বহু আগ থেকে আমি নবী ছিলাম। (জামে তিরমিযি : ৩৬০৯)

৩. যাকে প্রেরণের জন্য আবেদন :

পবিত্র বায়তুল্লাহ নির্মাণের পর হযরত ইবরাহীম (আ.) স্বীয় পুত্র ইসমাইলকে সাথে রেখে যাকে প্রেরণের জন্য আবেদন করেন। এ প্রসঙ্গে যা বললেন, আল্লাহ পাক পবিত্র কুরআনে তা তুলে ধরেছেন :

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

“প্রভু তাদের মধ্য হতে একজন রাসূল প্রেরণ করুন, যিনি আপনার আয়াতসমূহের বিবরণ দিবেন। তাদেরকে কিতাব ও জ্ঞান-বিজ্ঞান শেখাবেন এবং তাদেরকে পরিশুদ্ধ করবেন। নিঃসন্দেহে আপনি মহাপরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়। (সূরা আল বাকারা, আয়াত : ১২৯) মহান আল্লাহ অনুরূপ প্রার্থনা মঞ্জুর করে এ মহান রাসূল (সা.) কে কাজ্জিত বৈশিষ্ট্যসহ প্রেরণের ঘোষণা দেন। (সূরা আল বাকারা : ১৫১)। সেই সাথে সূরা আলে ইমরানের ১৬৪ নং আয়াতে এ বিষয়ে তার অনুগ্রহের কথা পুনর্ব্যক্ত করেন।

৪. যার রিসালতের প্রতিশ্রুতি গ্রহণ :

মহান আল্লাহ সকল নবী-রাসূলের ঐতিহাসিক সম্মেলনে যার রিসালাতের বিষয়ে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছেন তিনি হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আল্লাহ পাক বলেন,

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْنَاكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ

‘স্মরণ করান, যখন আল্লাহ নবীদের নিকট থেকে অঙ্গীকার নিলেন যে, আমি তোমাদেরকে কিতাব ও প্রজ্ঞা দিয়েছি। অতঃপর তোমাদের নিকট যা আছে তার সত্যায়নকারী হিসেবে একজন রাসূল (সা.) যখন আসবে, তখন নিশ্চয় তোমরা তার প্রতি ঈমান আনবে এবং তাকে সাহায্য করবে। আরো বলেন, তোমরা কি তা স্বীকার করলে এবং আমার অঙ্গীকার গ্রহণ করলে? তারা বললেন, আমরা স্বীকার করলাম। তিনি বললেন তবে তোমরা সাক্ষী থেকে, আমিও তোমাদের সাথে সাক্ষী রইলাম। (সূরা আলে ইমরান : ৮১)

সকল নবী ও রাসূল থেকে এ প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করে আল্লাহ পাক প্রমাণ করলেন, হযরত মুহাম্মদ (সা.) ইমামুল মুরসালিন, যিনি সকল নবী ও রাসূলের সরদার। তাঁর নবুওয়াত সবার আগেই নির্ধারিত তার নবুওয়াত ও রিসালাতের অনুসরণ অপারাপর নবীদের জন্যও আবশ্যিক, যদি তাঁর রিসালাতের সময়কালীন তাদের অবস্থান থাকে। পবিত্র মিরাজ রজনীতে তিনি সকল নবী-রাসূলের ইমাম হিসেবে বায়তুল মুকাদ্দাসে সালাত আদায় করেন। এতে ইমামুল মুরসালীন হিসেবে তার মর্যাদা আরো সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

৫. রাসূল হিসেবে প্রেরণের লক্ষ্য :

রাসূল প্রেরণের সুমহান উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে আল্লাহ পাক বলেন,
هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَىٰ الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ

তিনি সেই সত্তা যিনি তার রাসূলকে হেদায়াত ও সত্যদ্বীনসহ প্রেরণ করেছেন, যেন তিনি দ্বীন ইসলামকে অন্য সব মতাদর্শের উপর বিজয়ী আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন। (সূরা আত-তাওবা, আয়াত : ৩৩, সূরা আস সফ : ০৯) মূলত দ্বীন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মহান আল্লাহ অপরাপর নবী-রাসূল (সা.)-কে একই নির্দেশনা দিয়েছেন। তিনি বলেন, “দ্বীন প্রতিষ্ঠার বিষয়টি আমি তোমাদের উপর নির্ধারণ করে দিয়েছি। যে নির্দেশনা নূহ (আ.)-এর প্রতি ছিল। যে নির্দেশনা হে নবী! আপনার প্রতিও। যে নির্দেশনা ইবরাহীম, মূসা এবং ঈসা (আ.)-এর প্রতি ছিল। এটি এই যে, তোমরা দ্বীন প্রতিষ্ঠা কর, এতে কোনরূপ মতপার্থক্য সৃষ্টি করো না। (সূরা আশ্-শুরা : ১৩)

৬. তাঁর জীবনই উত্তম আদর্শ :

মহান আল্লাহ প্রিয় নবী (সা.)-এর জীবনকে উত্তম আদর্শ হিসেবে ঘোষণা দিয়ে বলেন,

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

“তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জীবনেই রয়েছে সুন্দরতম আদর্শ। (সূরা আল আহযাব : ২১) আল্লামা ইবনু কাসীর (রাহ.) বলেন, এ আয়াত দ্বারা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সকল কথা, কাজ ও অবস্থাদি অনুসরণের আবশ্যিকতা প্রমাণিত। (তাফসীর ইবনে কাসীর, খণ্ড : ০৬, পৃ : ৩৯১) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। ইরশাদ করেন,

فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

যারা আমার আদর্শ বিমুখ, তারা আমার দলভুক্ত নয় (বুখারি : ৫০৬৩) ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, অর্থনীতি, রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলের সকল দিক ও বিভাগে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর অনুসরণ ঈমানের অপরিহার্য দাবি।

৭. তাঁর রিসালাতের কর্মসূচি :

তাঁর রিসালাতের ৪টি কর্মসূচি নিয়ে আলোচনা করা হলো। আল্লাহ পাক বলেন :

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

“তিনিই নিরক্ষরদের মধ্য থেকে একজন রাসূল প্রেরণ করেছেন, যিনি তাদের কাছে পাঠ করেন তার আয়াতসমূহ, তাদেরকে পবিত্র করেন এবং শিক্ষা দেন কিতাব ও হিকমত। ইতঃপূর্বে তারা ছিল ঘোর পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত।

(সূরা জুমু'আ : ২)

৭.[ক]. আল্লাহর নিদর্শনাবলি উপস্থাপন : আল্লাহর নিদর্শনাবলিকে আয়াতুল্লাহ বলা হয়। আর أَيَا تِلْكَ اللَّهُ অর্থ : পবিত্র কুরআনের বাণীসমূহ, যা তিনি সকলের নিকট খুলে খুলে বিবরণ দিবেন। এর মাধ্যমে কুরআনের আয়াতসমূহের মর্মার্থ ও সঠিক ব্যাখ্যা তিনি উপস্থাপন করবেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ পাক বলেন, “আমি আপনার প্রতি ‘আয্ যিকুর তথা কুরআন নাযিল করেছি, যাতে মানুষকে তা স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেন, যা তাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে এবং যাতে তারা এ বিষয়ে চিন্তা-গবেষণা করতে সক্ষম হয়।

(সূরা আন নাহল: ৪৪)

এছাড়া সৃষ্টি জগতের সবকিছু আল্লাহর আয়াত (أَيَا تِلْكَ اللَّهُ) তথা আল্লাহর নিদর্শন। যাতে তার পরিচয় লাভের প্রমাণাদি বিরাজমান। এসব বিষয়ও

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) মানুষের নিকট উপস্থাপন করবেন। আল্লাহ্ পাক বলেন, নিঃসন্দেহে আসমান ও জমিনের সৃষ্টি, রাত ও দিনের আবর্তনের মাঝে জ্ঞানীদের জন্য নিদর্শন রয়েছে। (সূরা আলে ইমরান : ১৯০)

৭.[খ]। মানুষের আত্মার পরিশুদ্ধতা : মানুষের আত্মাসমূহের পরিশুদ্ধতা তার রিসালাতের দ্বিতীয় কর্মসূচি। যাকে تَزْكِيَةُ النَّفْسِ বলে।

পাপ-পঙ্কিলতা ও শিরক থেকে অন্তরকে কলুষমুক্ত করা। এতে মু'মিন জীবনে সাফল্য নেমে আসে। আল্লাহ্ পাক বলেন, فَمَنْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى যে হৃদয়ের পরিশুদ্ধতা অর্জন করলো সেই সফল। (সূরা আল আ'লা : ১৫) তাযকিয়া বা আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে মানুষ শিরক থেকে তাওহীদের দিকে, সংশয় থেকে দৃঢ় বিশ্বাসের দিকে এবং পাপাচার থেকে পুণ্যের দিকে ধাবিত হয়। (ইবনে কাসীর) কুফরি ও শিরকি পঙ্কিলতা থেকে পবিত্র করার নাম তাযকিয়া (তাফসীরে কুরতুবী)। তাযকিয়া বা আত্মশুদ্ধি বলতে অভ্যন্তরীণ পরিশুদ্ধতা বুঝানো হয়। এতে মানুষের অভ্যন্তরীণ অনুভূতি পবিত্র হয়। কর্ম ও আচরণে বিশুদ্ধতা পরিলক্ষিত হয়। পারিবারিক জীবন ও সামাজিক জীবন নিঃকলুষ থাকে। শিরকী মানসিকতা তাওহীদ মেজাজে পূর্ণতা লাভ করে। চারিত্রিক কালিমা থেকে মুক্ত হয়ে উত্তম চরিত্রে ভূষিত হওয়া যায়। হারাম থেকে হালাল পস্থা অবলম্বন ও আত্মশুদ্ধির শামিল (তাফসীর, ফী যিলালিল কুরআন) তাযকিয়া তথা আত্মার পরিশুদ্ধতার মাধ্যমে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সোনার মানুষ গড়ে তুলেছিলেন।

৭. [গ]। কিতাবের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ : এটি রিসালাতের তৃতীয় কর্মসূচি। কিতাব বলতে পবিত্র কুরআনুল কারীমকে বুঝানো হয়েছে; কুরআনে বর্ণিত আদেশ-নিষেধসহ সকল বিধি-বিধান এর অন্তর্ভুক্ত। (তাফসীরে কুরতুবী, তাফসীরে ইবনে কাসীর) কিতাব দ্বারা লিখিত বাণীসমূহকেও বুঝানো হয়, যা লওহে মাহফুজে সংরক্ষিত। আল্লাহ্ পাক বলেন:

بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ

এটি সেই পবিত্র কুরআন, যা লওহে মাহফুজে সংরক্ষিত। এছাড়া সৃষ্টি জগতের সকল বিষয়াদি যা আল্লাহ্ পাকের নিকট লিখিত আকারে রক্ষিত, তাকেও কিতাব বলা হয়। তিনি বলেন, أُمُّ الْكِتَابِ তার নিকটেই রয়েছে মূল কিতাব। (সূরা রা'দ : ৩৯)

৭. [ঘ]। হিকমত এর শিক্ষা প্রদান : এটি রিসালাতের ৪র্থ কর্মসূচি। এখানে হিকমত দ্বারা সুনাত বা প্রিয়নবী (সা.)-এর আদর্শ শিক্ষা প্রদান বুঝায়। দ্বীন

ইসলামের বিস্তারিত জ্ঞান ও ফিকহ সংক্রান্ত জ্ঞান ‘হিকমাত’ এর অন্তর্ভুক্ত।
আল্লাহ্ পাক বলেন,

وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا

যাকে হিকমত প্রদান করা হয়েছে, তাকে প্রভূত কল্যাণ দানে ভূষিত করা হয়েছে। (সূরা বাকারা : ২৬৯) [তাফসীরে তারাবী, ইবনু জারীর, হাদিস নং : ১৭১৪, ১৭১৫, ১৭১৬] এছাড়া হিকমতের শিক্ষা প্রদানের অপরাপর বিষয়ের মধ্যে রয়েছে : দ্বীনের পূর্ণজ্ঞান, বিজ্ঞান ও তথ্যাদি, সমস্যার সমাধানের সক্ষমতা, ব্যবহারিক জীবনে করণীয় দিক, মানবতার সেবা কার্যক্রম এবং সাংস্কৃতিক কার্যক্রম ইত্যাদি।

প্রিয় নবী সাইয়্যিদুল মুরসালীন হযরত মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ও রাসূল। তিনি জগতসমূহের জন্য রহমত। তাঁর আনীত জীবনবিধান সকল শ্রেণির মানুষের জন্য মুক্তি ও কল্যাণ বয়ে আনবে। সৃষ্টির আদি থেকে তিনি নবী। নবী হিসেবেই তিনি ধরার বুকে নবী হিসেবেই তাশরিফ এনেছেন। নবী হিসেবে বেড়ে উঠেছেন। কবি কতই না সুন্দর বলেছেন;

দেখ আমিনা মায়ের কোলে
দোলে শিশু ইসলাম দোলে
কচি মুখে শাহাদাতের
বাণী সে শোনায়ে।

তার নবুওয়াত ও রিসালাত কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। তিনিই পরকালে উম্মতকে জাহান্নাম থেকে মুক্তির জন্য মহান আল্লাহ্র নিকট বিশেষ সুপারিশ করবেন। তাঁর হাতে হাউজে কাউসারের পানি যারা পান করবেন জান্নাতে প্রবেশের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তৃষ্ণার্থ হবে না। আল্লাহ্ পাক আমাদেরকে জীবনের সর্বপর্যায়ে তাঁর সুমহান আদর্শ মেনে চলার তাওফীক দিন, হাশরে তাঁর শাফায়াত নসীব করুন এবং হাউজে কাউসার থেকে পানীয় গ্রহণের সুবর্ণ সুযোগদানে ধন্য করুন। আমীন।

লেখক : অধ্যক্ষ, বায়তুশ শরফ আদর্শ কামিল (অনার্স-মাস্টার্স) মাদ্রাসা,
চট্টগ্রাম ও খতিব, বায়তুশ শরফ কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ, চট্টগ্রাম।

সূরা ফাতিহার ফাযায়েল

তোয়হা মুহাম্মদ মোদাসির

الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد
الانبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين
اما بعد قال الله تعالى في كلامه المجيد
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم

وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ ﴿١﴾

নিশ্চয় আমি আপনাকে সাতটি আয়াত প্রদান করেছি, যেগুলো পুনঃ পুনঃ
আবৃত্তি হয়, আর শ্রেষ্ঠত্ব সম্পন্ন ক্বোরআন,

(১) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (২) اَلرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ (৩) مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ
(৪) اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ (৫) اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ (৬) صِرَاطَ
الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ (৭) غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ (অমিন)

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর যিনি সকল সৃষ্টি জগতের পালনকর্তা, যিনি
অত্যন্ত মেহেরবান ও দয়ালু, যিনি বিচার দিনের অধিপতি, আমরা একমাত্র
তোমারই ইবাদত করি এবং কেবল তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি।
আমাদেরকে সরল পথ দেখাও সে সমস্ত লোকের পথ, যাদেরকে তুমি
নিয়ামত দান করেছ। তাদের পথে নয়, যাদের প্রতি তোমার অভিসম্পাত
নাযিল হয়েছে এবং যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে।

পবিত্র কুরআনুল কারীম মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে সমগ্র মানবজাতির জন্য
অবতীর্ণ সর্বশেষ ও পূর্ণাঙ্গ আসমানি কিতাব। এটি কেবল ধর্মগ্রন্থ নয়, বরং
মানবজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রের জন্য পরিপূর্ণ একটি জীবন বিধান। মানুষের
আকীদা-বিশ্বাস, ইবাদত, নীতি-নৈতিকতা, পারিবারিক ও সামাজিক বন্ধন।
সমাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি পার্থিব ও পরকালের সফলতার পথ। এক
কথায় মানবজীবনের সবকিছুর সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা পবিত্র কুরআনে বর্ণিত
রয়েছে। মহান আল্লাহ কুরআন মজীদকে মানুষের জন্য হিদায়াত, নসীহত,
সত্য-মিথ্যার পার্থক্য নির্ণয়ক এবং মানবজাতির জন্য রহমত স্বরূপ অবতীর্ণ
করেছেন। যুগে যুগে মানবজাতি এই কিতাবের অনুসরণের মাধ্যমে অজ্ঞতা

ও বর্বরতার অনামিশ থেকে অমানিশা থেকে আলোর পথ লাভ করেছে।
সত্য, ন্যায়, সঠিক ও কল্যাণের পথে পরিচালিত হয়েছে।

এই কুরআনুল কারীমে প্রারম্ভে যে সূরাটি স্থান পেয়েছে তা হলো সূরা আল-ফাতিহা, যা কুরআনের একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সূরা। এ সূরা দ্বারা ই সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদত নামায আরম্ভ হয়। অবতরণের দিক দিয়েও পূর্ণাঙ্গ সূরারূপে এটি প্রথম অবতীর্ণ হয়। সূরা ইকুরা, সূরা মুযাযামিল, মুদাসিসর এর ক'টি আয়াত অবশ্য সূরা ফাতিহার পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছে। কিন্তু পূর্ণাঙ্গ সূরারূপে এ সূরার অবতরণই সর্বপ্রথম। আর এ কারণেই এটিকে ফাতিহাতুল কিতাব বা কুরআনের উপক্রমণিকা বলা হয়।

এ সূরার আয়াত সংখ্যা ৭টি হলেও এর বিষয়বস্তুর ব্যাপ্তি ও গভীরতা ব্যাপক। সূরা ফাতিহা সমগ্র কুরআনের সার-সংক্ষেপ, এ সূরাতে সম্পূর্ণ কুরআনের সারমর্ম সংক্ষিপ্তভাবে বলে দেওয়া হয়েছে। কুরআনের অন্যান্য সূরাসমূহ প্রক্ষান্তরে সূরা ফাতিহারই বিস্তৃত ব্যাখ্যাস্বরূপ। কারণ সম্পূর্ণ কুরআনুল কারীম প্রধানতঃ ঈমান ও নেক আমলের আলোচনাতেই কেন্দ্রীভূত। আর এ দু'টি মূলনীতিই সূরা ফাতিহাতে সংক্ষেপে তুলে ধরা হয়েছে বিধায় এই সূরাকে উম্মুল কিতাব, উম্মুল কুরআন ও কুরআনে আজীম বলে নামকরণ করা হয়েছে। (কুরতুবী)

কুরআন মজীদে তাফসীর গ্রন্থসমূহে সূরা ফাতিহার যতগুলো নাম উল্লেখ আছে, অন্য কোন সূরার এত নাম নেই। তাফসীরে রুহুল মা'আনীতে আল্লামা মাহমুদ আলুসি (রহ.) সূরা ফাতিহার ২২টি নাম উল্লেখ করেছেন। তার মধ্যে কয়েকটি উল্লেখ করা হলো—

১। ফাতিহাতুল কিতাব

২। উম্মুল কুরআন

৩। উম্মুল কিতাব

৪। আস্ সাবউল মাসানী

৫। আল-কুরআনুল আজীম

৬। সূরাতুশ শাফিয়া

৭। সূরাতুল হামদ

পবিত্র কুরআনে সূরা ফাতিহার মত দ্বিতীয় ও সূরার মত নেই—

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي بِنِ كَعْبٍ
كَيْفَ تَقْرَأُ فِي الصَّلَاةِ فَقَرَأَ أَمْ الْقُرْآنَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا أُنْزِلَتْ فِي التَّوْرَةِ وَلَا فِي الْإِنْجِيلِ وَلَا فِي

الرُّبُورَ وَلَا فِي الْفُرْقَانِ مِثْلَهَا وَإِنَّهَا سَبْعٌ مِّنَ الْمِثْنَيْنِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ الَّذِي أُعْطِيَتْهُ

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন-রাসূলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উবাই ইবনে কা'বকে এরশাদ করেছেন, "তুমি নামাজে কিভাবে কুরআন পড়ো?" তখন তিনি 'আলহামদু শরীফ' তথা সূরা ফাতিহা পড়লেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমালেন, "তাঁরই শপথ! যাঁর কুদরতের হাতে আমার প্রাণ, এটার মতো সূরা না তাওরাতে নাযিল হয়েছে, না ইনজীলে, না যবুরে, না কুরআনে। আর সেটা হচ্ছে বারংবার পঠনযোগ্য সাতটি আয়াত এবং কুরআনে-ই-আযীম। সেগুলো আমাকে দান করা হয়েছে।" (তিরমিযী)

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ بِنِ الْمُعَلَّى قَالَ كُنْتُ أَصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ فَدَعَانِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ أَجِبْهُ ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي كُنْتُ أَصَلِّي قَالَ أَلَمْ يَقُلِ اللَّهُ اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ ثُمَّ قَالَ أَلَا أَعْلَمُكُمْ أَعْظَمَ سُورَةٍ فِي الْقُرْآنِ قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَأَخَذَ بِيَدِي فَلَمَّا أَرَدْنَا أَنْ نَخْرُجَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ قُلْتَ لَا أَعْلَمُكُمْ أَعْظَمَ سُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ هِيَ السَّبْعُ الْمِثْنَيْنِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ الَّذِي أُوتِيَتْهُ-

হযরত আবু সা'ঈদ ইবনে মু'আল্লা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "আমি মসজিদে নামাযরত ছিলাম। তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ডাকলেন, আমি জবাব দিলাম না। অতঃপর (নামায শেষ করে) হাযির হলাম এবং আরয করলাম-'হে আল্লাহর রসূল! আমি নামায পড়ছিলাম।' রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, 'আল্লাহ তা'আলা কি একথা বলেননি! "আল্লাহ ও রসূল যখন তোমাদেরকে আহ্বান করেন, তখন সাথে সাথেই জবাব দাও!" অতঃপর বললেন, "আমি কি তোমাদের মসজিদের যাবার পূর্বে কুরআন কারীমে মহান সূরা বলে দেবো না? তারপর হুযুর আমার হাত আপন হাত মুবারকে নিলেন। যখন বাইরে যেতে লাগলেন, আমি বললাম! "হে আল্লাহর রাসূল, আপনি বলেছিলেন, "আমি তোমাদেরকে কুরআন কারীমে মহান সূরা বলে দেবো"। হুযুর এরশাদ করলেন, 'তা হচ্ছে "আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামিন"', । এ তো ওই সাতটি বারংবার পঠনযোগ্য আয়াতে কারীমা এবং মহান কুরআন, যা আমাকে দান করা হয়েছে। (বুখারী)

মিরকাত প্রণেতা উল্লেখ করেন, সমস্ত আসমানি কিতাবের বিষয়বস্তুগুলো পবিত্র কুরআনে রয়েছে। সম্পূর্ণ কুরআনের বিষয়বস্তু সূরা ফাতিহার মধ্যে

রয়েছে। সমগ্র সূরা ফাতিহার বিষয়বস্তু 'বিসমিল্লাহর' মধ্যে রয়েছে, আর 'বিসমিল্লাহর' বিষয়বস্তুসমূহ সেটার 'ব' (বা)-এর নোক্তার মধ্যে নিহিত আছে। যেহেতু সূরা ফাতিহার মধ্যে সমগ্র কুরআনের বিষয়বস্তু রয়েছে। তাই রসুলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূরা ফাতিহাকে বড় সূরা বলেছেন-

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بَيْنَمَا جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَاعِدٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ نَفِيضًا مِنْ فَوْقِهِ فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ هَذَا بَابٌ مِنَ السَّمَاءِ فَتُحِ الْيَوْمَ لَمْ يَفْتَحْ قَطُّ إِلَّا الْيَوْمَ فَنَزَلَ مِنْهُ مَلَكٌ فَقَالَ هَذَا مَلَكٌ نَزَلَ إِلَى الْأَرْضِ لَمْ يَنْزِلْ قَطُّ إِلَّا الْيَوْمَ فَسَلَّمَ فَقَالَ أُنَبِّئُ بُرَيْرِينَ أَوْ تَيْتَهُمَا لَمْ يُؤْتِيَهُمَا نَبِيٌّ قَبْلَكَ فَاتِحَةُ الْكِتَابِ وَخَوَاتِيمُ سُورَةِ الْبَقَرَةِ لَنْ تَقْرَأَ بِحَرْفٍ مِنْهُمَا إِلَّا أُعْطِيَتْهُ-

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন হযরত জিবরাঈল (আ.) নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট বসেছিলেন, তখন হুজুর পাক উপর থেকে আওয়াজ শুনতে পেলেন, তিনি মাথা মুবারক উঠালেন। হযরত জিবরাঈল (আ.) আরয করলেন, 'এটা আসমানের ওই দরজা খোলা হয়েছে, যা আজ ব্যতিত কখনো খোলা হয়নি, তা দিয়ে একটা ফেরেশতা অবতরণ হলেন। জিবরাঈল (আ.) বললেন, 'ইনি ওই ফেরেশতা পৃথিবীতে অবতরণ করলেন। যিনি আজ ব্যতিত আর কখনো অবতরণ করেননি, তিনি সালাম আরয করলেন, অতঃপর বললেন, 'আপনি ধন্য ওই দু'টি নূর দ্বারা, যেগুলো আপনাকে দেয়া হয়েছে, আপনার পূর্বে অন্য কোন নবীকে দেয়া হয়নি। সূরা ফাতিহা ও সূরা বাক্বারার শেষ আয়াতসমূহ। উক্ত এই দু'টি সূরার একটি মাত্র হরফ পড়লেও আপনি সওয়াব লাভ করবেন।' (মুসলিম)

সূরা ফাতিহার আয়াত সংখ্যা সাত। প্রথম তিনটি আয়াত আল্লাহর প্রশংসা এবং শেষের তিনটি আয়াত মানুষের পক্ষ থেকে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা ও আবেদনের বিষয়বস্তুর সংমিশ্রণ। মাঝখানের একটি আয়াত প্রশংসা ও দু'আ মিশ্রিত সেটি হচ্ছে-

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) قَالَ اللَّهُ تَعَالَى حَمْدُنِي عَبْدِي وَإِذَا قَالَ (الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ) قَالَ اللَّهُ تَعَالَى أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي وَإِذَا قَالَ (مَالِكِ يَوْمَ الدِّينِ) قَالَ مَجْدُنِي عَبْدِي وَقَالَ مَرَّةً فَوَضَّ إِلَيَّ عَبْدِي فَإِذَا قَالَ (إِيَّاكَ نَعْبُدُ

وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ) قَالَ هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ فَإِذَا قَالَ (اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ) قَالَ هَذَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ

মুসলিম শরীফে হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করছেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, মহান আল্লাহ বলেন- নামায অর্থাৎ সূরা ফাতিহা আমার এবং আমার বান্দাদের মধ্যে দু'ভাগে বিভক্ত। অর্ধেক আমার জন্য আর অর্ধেক আমার বান্দাদের জন্য। আমার বান্দাগণ যা চায়, তা তাদেরকে দেয়া হবে। অতঃপর হুজুর বলেছেন যে, যখন বান্দাগণ বলে (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) তখন আল্লাহ বলেন, আমার বান্দাগণ আমার প্রশংসা করেছে। আর যখন বান্দাগণ বলে (الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ) তিনি বলেন, তারা আমার মহত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করেছে। আর যখন বান্দাগণ বলে (مَالِكِ يَوْمَ الدِّينِ) তখন তিনি বলেন, আমার বান্দাগণ আমার গুণকীর্তন করেছে। আর যখন বান্দাগণ বলে (إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ) তিনি বলেন, এ আয়াতটি আমার এবং আমার বান্দাদের মধ্যে সংযোগ, কেননা এর এক অংশে আমার প্রশংসা, অপর অংশে বান্দাদের দোয়া ও প্রার্থনা রয়েছে। ও কথাও বলা হয়েছে যে- বান্দাগণ যা চাইবে, তারা তা পাবে। বান্দাগণ বলে ((اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ..... وَلَا الضَّالِّينَ)) মহান আল্লাহ বলেন- এ সবই আমার বান্দাদের জন্য এবং তারা যা প্রার্থনা করবে তা দেয়া হবে। (মাযহারী)

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমান- মহান আল্লাহ তাঁর কোন নিয়ামত কোন বান্দাকে দান করার পর সে যখন বলে 'الحمد لله' তখন বুঝতে হবে, সে যা পেয়েছে। এ শব্দ তা থেকে অনেক শ্রেয়। তিনি আরও এরশাদ করেন, কোন ব্যক্তি যদি সমগ্র বিশ্বের সকল নিয়ামত লাভ করে এবং তার জন্য 'الحمد لله' বলে। তাহলে বুঝতে হবে যে, সমগ্র জাহানের নিয়ামতসমূহের অপেক্ষা তার এ শব্দ বলা অনেক উত্তম। (কুরতুবী)

কারো কারো অভিমত- “সূরা ফাতিহা” কুরআনের সারমর্ম আর إِيَّاكَ نَعْبُدُ سূরা ফাতিহার সারমর্ম। কেননা এর প্রথম অংশে রয়েছে শিরক থেকে মুক্তির ঘোষণা এবং দ্বিতীয় অংশে মহান আল্লাহর পরিপূর্ণ শক্তি ও কুদরতের স্বীকৃতি।

শয়তানের বিলাপ:

সুহায়লী বর্ণনা করেন, ইবলিস জীবনে চার বার বিলাপ করে-

১. অভিশপ্ত হওয়ার সময়।
 ২. জান্নাত থেকে বিতাড়িত হওয়ার সময়।
 ৩. রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময়।
 ৪. সূরা ফাতিহা নাযিল হওয়ার সময়।
- আল্লামা ইবনে কাসীর, আল বিদায়াওয়ান নিহায়া খ, ২ পৃ.-২৫৫
সীরাতে হালাতুনবী পৃ.-৮৯

লেখক : অধ্যক্ষ, কামাল ইশকে মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
ফাযিল(স্নাতক) মাদ্রাসা
বাকলিয়া, চট্টগ্রাম।

আমল কবুল হওয়ার জন্য বিশুদ্ধ ঈমান অপরিহার্য

আলহাজ্জ মাওলানা মুহাম্মদ জিয়াউল করিম

বিশুদ্ধ ঈমানের গুরুত্ব:

মানুষের প্রকৃতি ও মানবজাতির ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই, সঠিক বিশ্বাসই মানুষের সকল সফলতা ও সৌভাগ্যের ভিত্তি। বিশ্বাসই মানুষের পরিচালিকা শক্তি। সঠিক বিশ্বাস মানুষকে সফলতার শীর্ষে তুলে দেয়, তার জীবনে বয়ে আনে অনাবিল শান্তি ও আনন্দ। আর ভুল বিশ্বাস বা কু-সংস্কার মানুষের মনকে সদাব্যস্ত, অস্থির ও হতাশ করে। কারণ, যেমন বিশ্বাস করে তেমনি আমল করে। বিশ্বাস ও কর্মের সমন্বয়ে ইসলাম। সঠিক বিশ্বাস তথা ঈমান ইসলামের মূলভিত্তি। আমরা যত ইবাদত বা সৎকর্ম করি সেগুলো আল্লাহর নিকট কবুল বা গ্রহণযোগ্য হওয়ার প্রথম শর্ত শিরক ও কুফরমুক্ত বিশুদ্ধ ঈমান। অর্থাৎ বেঈমানের কোন সৎকর্ম ও চেষ্টা আল্লাহ কবুল করবেন না।। মহান আল্লাহ কুরআনুল কারীমের বিভিন্ন স্থানে একথা বলেছেন। একস্থানে ইরশাদ করা হয়েছে-

وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا

"এবং যে ব্যক্তি পারলৌকিক জীবনে কল্যাণ চায়, সে জন্যে চেষ্টা করে এবং সে বিশ্বাসী বা মুমিন হয়, তাহলে তার চেষ্টা ও কর্ম কবুল করা হবে।" আয়াতে চেষ্টা ও কর্ম কবুল হওয়ার জন্য ঈমানদার হওয়ার শর্ত আরোপ করা হয়েছে।" সূরা বনি ইসরাঈল।

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেছেন-

مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْتَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ

"যে ব্যক্তি অন্যায় কাজ করবে, সে তার অন্যায় পরিমাণই প্রতিফল লাভ করবে। আর যে পুরুষ বা নারী সৎকর্ম করবে, সে যদি মুমিন বা বিশ্বাসী

হয়, তবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। সেখানে অফুরন্ত নিয়ামত ও রিজিক ভোগ করবে।"সূরা গাফের।

দুনিয়াতে আল্লাহর নিয়ামত ও বরকত অর্জন এবং আল্লাহর ওয়াদাকৃত পবিত্র জীবন লাভের শর্ত হলো সঠিক ঈমান। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন-

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلْيُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

অর্থ- “যদি কোনো পুরুষ বা মহিলা সৎকর্ম করে এবং সে মু'মিন হয়, আমরা অবশ্যই তাকে [দুনিয়াতে] পবিত্র জীবন দিয়ে জীবিত রাখব এবং [আখিরাতে] তাদেরকে তাদের সর্বোত্তম কর্মের উপর ভিত্তি করে তাদের পুরস্কার দান করব।”সূরা নাহল।

দুনিয়াতে সার্বিক বরকত ও কল্যাণ লাভের জন্যে প্রথমত সঠিক ও বিশুদ্ধ ঈমানের অধিকারী হতে হবে। অতঃপর আল্লাহকে ভয় করে সৎ জীবন-যাপন করতে হবে। আর কুফরি বা অবিশ্বাসের শাস্তি হলো ধ্বংস ও ক্ষতি। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে-

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ
وَالْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

“যদি জনপদসমূহের অধিবাসীরা ঈমান আনত এবং আল্লাহকে ভয় করে তার নির্দেশিত পথে চলতো, তবে আমি তাদের জন্যে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর বরকত-কল্যাণসমূহ উন্মুক্ত করে দিতাম। কিন্তু তারা অবিশ্বাস করল; কাজেই আমি তাদের কর্ম অনুযায়ী ফল দান করলাম।”সূরা আরাফ।

আল্লাহর বিলায়াত, নৈকট্য, বন্ধুত্ব ও সম্ভ্রুতি অর্জনের প্রথম ধাপই বিশুদ্ধ ঈমান। মহান আল্লাহ বলেন-

إِلَّا إِنْ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا
يَتَّقُونَ

“জেনে রাখ! নিশ্চয়ই আল্লাহর ওলীগণের কোন ভয় নেই এবং তাঁরা চিন্তাগ্রস্তও হবে না। আর তারাতো সে সমস্ত লোক যারা ঈমান এনেছে এবং আল্লাহর অসম্ভ্রুতি থেকে আত্মরক্ষা করে চলেছে তথা তাকওয়ার পথ অনুসরণ করেছে।” সূরা ইউনুচ।

ঈমান বিনষ্টকারী বিষয়াদি সম্পর্কে জ্ঞানলাভের গুরুত্ব:

এখানে দুটি বিষয় অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে লক্ষণীয়- প্রথমত মানুষ প্রকৃতিগতভাবেই মানবীয় বিবেক, বুদ্ধি ও যুক্তির মাধ্যমে মহান আল্লাহর অস্তিত্ব অনুভব ও প্রমাণ করতে পারে। কিন্তু তাঁর প্রতি বিশ্বাসের স্বরূপ ও বিস্তারিত বিষয়াদির অনুভব করতে পারে না। এজন্যে ওহীর জ্ঞানের উপর নির্ভর করতে হয়। তাই কুরআন ও হাদীসের আলোকে ইসলামী ঈমানের স্বরূপ, ভিত্তি, আরকান ইত্যাদি বিস্তারিত অবগত হওয়া ছাড়া বিগুহ্ন ঈমান অর্জন করা সম্ভব নয়।

দ্বিতীয়ত ঈমান অর্জনের ন্যায় তা সংরক্ষণ করাও অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যুগে যুগে অনেক জাতিই নবী-রাসূলগণের মাধ্যমে আসমানি হেদায়েত ও ঈমান লাভ করেছে। কিন্তু তারা তা সংরক্ষণ করতে পারে নি। বরং ঈমান বিনষ্টকারী বিভিন্ন বিশ্বাস বা কর্মের মাধ্যমে তারা ঈমান হারিয়ে ফেলেছে। এজন্যে ঈমান বিনষ্টের কারণ ও অবিশ্বাসের স্বরূপ জানা মু'মিনের অতীব প্রয়োজনীয় বিষয়।

কুরআনুল কারীমে ইহুদি, খ্রিস্টান, আরব্য কাফিররা ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। এরা সকলেই নিজেদেরকে খাঁটি মু'মিন বলেই দাবি ও বিশ্বাস করত। তারা মুহাম্মদ (সঃ) এর দীনকেও বিদ্রোহিত ও পূর্বপুরুষদের মাধ্যমে প্রাপ্ত খাঁটি ধর্মেও ব্যতিক্রম বলে মনে করত। অথচ তারা সকলেই ঈমান বিনষ্টকারী শিরক, কুফর ইত্যাদির মধ্যে লিপ্ত ছিল। তারা অনেক নেককর্ম করত এবং আল্লাহর ইবাদত বন্দেগী করত। কিন্তু ঈমান বিনষ্টকারী বিষয়াদিতে বা শিরক-কুফরে লিপ্ত থাকা অবস্থায় এসব কর্ম কখনোই আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। এজন্যে মহান আল্লাহ বলেন-

وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَىٰ مَنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

"নিশ্চয়ই আপনার এবং আপনার পূর্বে যেসব নবী-রাসূল গত হয়েছেন, তাঁদের প্রতি এই ওহী প্রেরণ করা হয়েছে যে, যদি আপনি শিরকে লিপ্ত হন, তবে অবশ্যই আপনার কর্ম বিনষ্ট হয়ে যাবে এবং আপনি নিশ্চিতরূপে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবেন।" সূরা জুমর।

অন্যত্র ইরশাদ করা হয়েছে-

وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ
"আর কেউ ঈমান প্রত্যাখ্যান করলে তার কর্ম বিনষ্ট বা নিষ্ফল হবে এবং সে পরকালে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।" সূরা মায়দাহ।

আল্লাহ তায়ালা আরো ইরশাদ করেছেন-

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ
بِاللَّهِ فَقَدْ أَفْترَىٰ إِنَّمَا عَظِيمًا

"আল্লাহ তাঁর সাথে শরিক করার অপরাধ ক্ষমা করেন না। তা ছাড়া
অন্যান্য অপরাধ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন এবং যে কেউ আল্লাহর সাথে
শরিক করে সে এক মহাপাপ করে।" সূরা নিসা।

অতএব, ঈমান বিনষ্টকারী বিষয়ের স্বরূপ, এগুলোর কারণ ও পূর্ববর্তী
উম্মতদের বিভ্রান্তির কারণ ও প্রেক্ষাপট অবগত হওয়া মুমিনের অন্যতম
দায়িত্ব। অন্যথায় শয়তানের প্ররোচনায় অর্জিত ঈমান বিনষ্ট হওয়ার সমূহ
আশঙ্কা থেকে যায়।

ইসলামী আকীদার উৎস:

ধর্মীয় বিশ্বাস বা আকিদার ক্ষেত্রে অনেক সম্প্রদায় লোকাচারের উপর
নির্ভর করেছেন। আবার কেউ কেউ দর্শন, যুক্তি ইত্যাদির
উপর নির্ভর করেছেন। কিন্তু ইসলামী শিক্ষানুসারে আকীদার ক্ষেত্রে
একমাত্র অহীর জ্ঞানের উপরই নির্ভর করতে হয়। ঈমান বা ধর্মবিশ্বাসের
কেন্দ্র হচ্ছেন মহান স্রষ্টা আল্লাহ তায়ালা।

এজন্যে কুরআন ও হাদীসে একদিকে যেমন আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহীর
মাধ্যমে পাওয়া জ্ঞানের উপর ঈমান বা বিশ্বাসের ভিত্তি স্থাপন করার জন্যে
নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, অপরদিকে তেমনি লোকাচার, কুসংস্কার,
সামাজিক প্রচলন, ধর্মগুরু বা পূর্বপুরুষদের শিক্ষা, অস্পষ্ট ভাষা ধারণা বা
নিজের ব্যক্তিগত যুক্তি ও পছন্দের উপর বিশ্বাসের ভিত্তি স্থাপন করতে
বিশেষভাবে নিষেধ করা হয়েছে। আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত ওহীর জ্ঞান
ছাড়া নিজের ধারণা ও মত, সমাজের প্রচলন ইত্যাদির উপর নির্ভরতা
মানুষের বিভ্রান্তি ও পথভ্রষ্টতার অন্যতম কারণ বলে কুরআনুল কারীমের
বিভিন্ন স্থানে বলা হয়েছে।

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-

اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ

অর্থ- তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে তোমাদের নিকট যা অবতীর্ণ
হয়েছে তোমরা তার অনুসরণ কর এবং তাকে ছাড়া অন্যান্য
অভিভাবককে অনুসরণ করণা। “সূরা আরাফ”

বিভ্রান্তিকর আকীদা বা বিশ্বাস থেকে সতর্ক থাকতে হবে:

রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর আদর্শই মু'মিনের নাজাতের একমাত্র পথ। সব বিষয়ের ন্যায় ঈমান ও আকীদার ক্ষেত্রে তাঁর আদর্শ থেকে বিচ্যুতি কঠিন পাপ ও ধ্বংসের পথ। তিনি যে কর্ম করেননি, সে কর্মকে বুজুর্গি বা দীনদারী মনে করার অর্থ তাঁর সুন্নতকে অপূর্ণ বলে গণ্য করা। অনুরূপভাবে বিশ্বাস ও আকীদার ক্ষেত্রে তিনি যা বলেননি তা বলা বা অনুরূপ কোন বিষয়কে ইসলামি বিশ্বাসের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য করাও তাঁর সুন্নতকে অবজ্ঞা ও বাড়াবাড়ির শামিল। এরূপ করা কঠিন পাপ। কর্মের ক্ষেত্রে পাপ না থাকলেও বিশ্বাস বা আকীদার ক্ষেত্রে এরূপ সুন্নত-বিরোধিতার কারণে এ ব্যক্তি পাপী হন। এরূপ ব্যক্তি বিশ্বাসের বিভ্রান্তির কারণে জাহান্নামী হবে বলে হাদীস শরীফে বলা হয়েছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা:) বলেন,

রাসূল (সঃ) বলেছেন-

إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقْتُ عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِنْهُ وَتَفَرَّقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً قَالُوا وَمَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَنَا عَلَيْهِ (الْيَوْمَ) وَاصْحَابِي

"ইসরাইলের সন্তানরা ৭২ দলে বিভক্ত হয়েছিল। আর আমার উম্মত ৭৩ দলে বিভক্ত হবে। একটি মাত্র দল ব্যতীত এদের মধ্যে সকলেই জাহান্নামী হবে। সাহাবাগণ প্রশ্ন করেন, হে আল্লাহর রাসূল! এ মুক্তিপ্রাপ্ত দলটি কারা? এবং তিনি বলেন, আমি এবং আমার সাহাবীগণ যার উপর আছি।"

এখানে এ সকল ফিরকার জাহান্নামী হওয়ার অর্থ এই নয় যে, এরা সকলেই কাফির। বরং আকীদার ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (সঃ) ও সাহাবীগণের সুন্নতের ব্যতিক্রম বিশ্বাস উদ্ভাবনের ফলে তাদের আকীদাগত বিদআত কর্মগত বিদআতের দিকে টেনে নিয়ে যায়।

এজন্যে বিশ্বাসের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ও তাঁর সাহাবীগণ কী বিশ্বাস পোষণ করতেন, তা জানা একজন মু'মিনের জন্য অতীব প্রয়োজন। অতএব, ঈমান বিশুদ্ধ ও নির্ভেজাল হতে হবে। দুধ দুহন করে ছিদ্রযুক্ত পাত্রে নিলে যেমন দুধ গলে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে তেমনিভাবে বিশুদ্ধ ও নির্ভেজাল ঈমান ছাড়া সৎকর্ম করলে আমলের সাওয়াব নষ্ট ও বাতিল হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা খুবই বেশি।

সুতরাং আমলের আগে ঈমান বা আন্তরিক বিশ্বাসকে ছিদ্রযুক্ত ও ভেজালমুক্ত করা একান্ত জরুরী।

লেখক: সিনিয়র শিক্ষক, চুনতী হাকিমিয়া কামিল মাদরাসা।

লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।

পুনরুত্থান ও হাশরের ময়দানের বর্ণনা

হাফেজ মাওলানা মুহিউদ্দিন মাহবুব

ইসলামের মৌলিক বিশ্বাসসমূহের (আকীদা) মধ্যে আখিরাতের প্রতি ঈমান অন্যতম। একজন মুসলমানের ঈমান তখনই পূর্ণতা লাভ করে, যখন সে আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতা, কিতাব, রাসূলগণ, তাকদীর এবং মৃত্যুর পর পুনরুত্থান ও আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে। কুরআনুল কারিমে বহু স্থানে পুনরুত্থান (বা'আস), হাশর, হিসাব-নিকাশ, জান্নাত ও জাহান্নামের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এসব বিষয় মানুষের অন্তরে আল্লাহভীতি, জবাবদিহিতার অনুভূতি এবং নেক আমলের আগ্রহ সৃষ্টি করে।

পৃথিবীর জীবন ক্ষণস্থায়ী। মানুষ জন্মগ্রহণের পর শৈশব, কৈশোর, যৌবন, প্রৌঢ় ও বায়োবৃদ্ধকালের কোনো এক বাঁকে মৃত্যুর সাথে আলিঙ্গন করে। মৃত্যু অমোঘ সত্য বিধান। মানুষের ভালো মন্দ যাচাই করার জন্য আল্লাহ মৃত্যু দিলেন। আল্লাহ বলেন,

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ۖ وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً ۗ وَآلَيْنَا
تَرْجَعُونَ

প্রত্যেক প্রাণীকে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। আর আমি ভালো ও মন্দ অবস্থার মধ্যে ফেলে তোমাদের সবাইকে পরীক্ষা করছি, শেষ পর্যন্ত তোমাদের আমার দিকে ফিরে আসতে হবে।^{৮২}

ইসলাম শিক্ষা দেয় যে, মৃত্যু জীবনের সমাপ্তি নয়; বরং এটি আখিরাতের জীবনের সূচনা। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা সকল মানুষকে পুনরায় জীবিত করবেন, তাদের আমলের হিসাব গ্রহণ করবেন এবং ন্যায্যবিচারের ভিত্তিতে জান্নাত বা জাহান্নামে স্থান নির্ধারণ করবেন। এই পুনর্জীবিত হওয়ার ঘটনাকেই বলা হয় পুনরুত্থান (বা'আস)।

আখিরাতের প্রতি ঈমানের গুরুত্ব:

আখিরাতের প্রতি ঈমান ইসলামের অন্যতম মৌলিক স্তম্ভ। কুরআনের বহু স্থানে আল্লাহ তা'আলা ঈমানের সঙ্গে আখিরাতের বিশ্বাসকে একত্রে উল্লেখ

৮২. সূরা আশ্বিয়া: ৩৫

করেছেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন هُمْ يُوقَفُونَ আর তারা আখিরাত সম্পর্কে দৃঢ় বিশ্বাস রাখে।^{৮৬} আরও বলেন তিনি مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস মানুষের চরিত্র গঠনে বিচার দিবসের মালিক।^{৮৭} আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস মানুষের চরিত্র গঠনে গভীর প্রভাব ফেলে। যে ব্যক্তি বিশ্বাস করে যে প্রতিটি কাজের হিসাব দিতে হবে, সে অন্যায়, জুলুম, প্রতারণা ও পাপ থেকে বিরত থাকার চেষ্টা করে। আখিরাত দুনিয়ার প্রতি অতিরিক্ত আসক্তি কমায় যেহেতু আখিরাতের তুলনায় দুনিয়ার জীবন ক্ষণস্থায়ী। আল্লাহ বলেন— وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى আর আখিরাতই উত্তম ও অধিক স্থায়ী।^{৮৮}

তাই আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস মানুষকে দুনিয়া ত্যাগ করতে নয়, বরং দুনিয়াকে আখিরাত অর্জনের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করতে শেখায়। অন্যায় থেকে বিমুখ হয়ে ন্যায়বিচারের প্রতি আস্থা সৃষ্টি করে। রিপূর তাড়নায় দুনিয়ায় অনেক অপরাধী অপরাধ করে শাস্তি না পেয়েই মারা যায় এবং অনেক নিরপরাধ মানুষ তাদের প্রাপ্য অধিকার পায় না। আখিরাতের বিশ্বাস মানুষকে নিশ্চিত করে যে আল্লাহর আদালতে কোনো অন্যায়ই অমীমাংসিত থাকবে না। আল্লাহ তা‘আলা বলেন, اَلْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ اَلْيَوْمَ اِنَّ اِلٰهَ سَرِيعِ الْحِسَابِ (বলা হবে,) আজ প্রত্যেক প্রাণীকে তার কৃতকর্মের প্রতিদান দেয়া হবে। আজ কারো প্রতি কোন জুলুম হবে না। আল্লাহ অতি দ্রুত হিসেব গ্রহণকারী।^{৮৯} আত্মশুদ্ধি ও উত্তম চরিত্র গঠনে ভূমিকা রাখে। আখিরাতের জবাবদিহির চিন্তা মানুষকে তাকওয়া, ইখলাস, আমানতদারি, বিনয়, ক্ষমাশীলতা ও উত্তম আচরণ অর্জনে সাহায্য করে। জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য উপলব্ধি করায় আখিরাতের বিশ্বাস মানুষকে বুঝতে সাহায্য করে যে দুনিয়া স্থায়ী আবাস নয়। আল্লাহ বলেন— وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ দুনিয়ার জীবন তো প্রতারণার সামগ্রী ছাড়া কিছুই নয়।^{৯০}

পুনরুত্থান (বা‘আস) কী?

^{৮৬} সূরা আল-বাকারাহ: ৪

^{৮৭} সূরা আল-ফাতিহা: ৪

^{৮৮} সূরা আল-আ‘লা: ১৭

^{৮৬} সূরা আল-মুমিন: ১৭

^{৮৭} সূরা আলে ইমরান: ১৮৫

বা‘আস (البعث) শব্দের অর্থ হলো মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত করে তোলা। ইসলামী পরিভাষায়, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা সকল মানুষকে কবর থেকে জীবিত করবেন এবং হিসাব-নিকাশের জন্য হাশরের ময়দানে সমবেত করবেন—এ ঘটনাকে পুনরুত্থান বলা হয়। এটি এমন একটি সত্য, যা আল্লাহর অসীম ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ। যিনি প্রথমবার মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, তাঁর জন্য পুনরায় সৃষ্টি করা আরও সহজ। কুরআনের আলোকে পুনরুত্থানের প্রমাণ, আল্লাহ প্রথম সৃষ্টি করেছেন, তিনিই পুনরায় সৃষ্টি করবেন আল্লাহ তাআলা বলেন عَلَيْهِ وَهُوَ الَّذِي يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ তিনিই প্রথমবার সৃষ্টি করেন, তারপর পুনরায় সৃষ্টি করবেন; আর এটি তাঁর জন্য আরও সহজ।^{৮৮} শুকনো জমি জীবিত হওয়ার উপমা আল্লাহ তাআলা বলেন وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ تুমি ভূমিকে শুষ্ক দেখো; অতঃপর যখন আমি তার ওপর বৃষ্টি বর্ষণ করি, তখন তা সজীব ও স্ফীত হয়ে ওঠে।^{৮৯} যেমন মৃত জমি বৃষ্টিতে জীবিত হয়, তেমনি আল্লাহ মানুষকেও মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবিত করবেন। মানুষের অস্তি পুনর্জীবিত করার ক্ষমতা আল্লাহ তাআলা বলেন قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ পুনর্জীবিত করবেন।^{৯০} এই আয়াত পুনরুত্থান অস্বীকারকারীদের সুস্পষ্ট জবাব প্রদান করে। পুনরুত্থান সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন,

حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ أَبِي صَغِيرَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تُحْشَرُونَ خِفَاءً غَرَاءً غُرْلًا «قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ يَنْظُرُونَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ؟ فَقَالَ: «الْأَمْرُ أَشَدُّ مِنْ أَنْ يُهْمَّهُمْ ذَلِكَ»

কিয়ামতের দিন মানুষ খালি পায়ে, উলঙ্গ এবং খতনাবিহীন অবস্থায় পুনরুত্থিত হবে। (সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিম) হযরত আয়িশা (রা.) এ কথা শুনে জিজ্ঞাসা করেন, “তখন কি মানুষ একে অপরের দিকে তাকাবে?” রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন সেদিনের অবস্থা এত ভয়াবহ হবে যে, কারও

৮৮. সূরা আর-রুম: ২৭

৮৯. সূরা আল-হাজ্জ: ৫

৯০. সূরা ইয়াসীন: ৭৯

অন্যের দিকে তাকানোর সুযোগ থাকবে না। এ হাদিস কিয়ামতের দিনের ভয়াবহতা ও মানুষের অসহায় অবস্থার চিত্র তুলে ধরে।

এ হাদীছে হাশর-ময়দানের ভয়ানক পরিস্থিতি তুলে ধরা হয়েছে। সেদিন নারী পুরুষ সকলকে এমনভাবে জড়ো করা হবে যে, কারও পায়ে জুতা থাকবে না, শরীরে পোশাক থাকবে না এবং সকলেই থাকবে খতনাবিহীন অবস্থায়। মানুষ দুনিয়ায় যেভাবে এসেছিল ঠিক সেভাবেই তাদেরকে হাশরের ময়দানে একত্র করা হবে। যেমন কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে-

وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرْكُنتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ

কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা তাদেরকে বলবেন,) তোমরা আমার কাছে নিঃসঙ্গ অবস্থায় এসেছ, যেমন আমি প্রথমে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছিলাম। আর আমি তোমাদেরকে যা-কিছু দান করেছিলাম, তা তোমাদের পেছনে ফেলে এসেছ। অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে تَعُوذُونَ “তিনি যেভাবে প্রথমে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তোমরা সেভাবেই ফিরে আসবে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত এক হাদীছে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

إنكم محشورون حفاة غرلا: (কما بدأنا أول خلق نعيده) [الأنبياء: ١٠٤] ، وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم

কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে খালি পায়ে উলঙ্গ শরীরে খতনাবিহীন অবস্থায় সমবেত করা হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন- (কما بدأنا أول خلق نعيده) আমি পুনরায় তাকে সৃষ্টি করব, যেভাবে প্রথমবার সৃষ্টির সূচনা করেছিলাম।^১ কিয়ামতের দিন সমস্ত মাখলুকের মধ্যে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে সবার আগে কাপড় পরানো হবে।

প্রশ্ন হতে পারে, কোনও কোনও হাদীছ দ্বারা তো জানা যায় মৃত ব্যক্তি যে পোশাকে মারা যায় সে পোশাকেই তাকে উঠানো হবে, যেমন হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাযি.থেকে বর্ণিত এক হাদীছে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন فِيهَا يَمُوتُ فِي ثِيَابِهِ الَّتِي يَمُوتُ فِيهَا “নিশ্চয়ই মৃত ব্যক্তিকে উঠানো হবে তার ওই পোশাকেই, যে পোশাকে তার মৃত্যু হয়।^২

^১ সূরা আযিয়া: ১০৪

^২ আবু দাউদ- ৩১১৪, মুসতাদরাক লিল হাকিম- ১২৬০, বায়হাক্কি- ৬৬৭৭

এর উত্তর হলো, সম্ভবত কাউকে কবর থেকে উঠানো হবে নগ্ন অবস্থায় এবং কাউকে পোশাক পরিহিত অবস্থায়। অথবা কবর থেকে সকলকেই পোশাক পরিহিত অবস্থায় উঠানো হবে, তারপর হাশরের সূচনাকালে সকলের পোশাক খুলে পড়ে যাবে এবং সবাইকে নগ্ন অবস্থায় হাশরের ময়দানে একত্র করা হবে। কারও কারও মতে আবু সাঈদ রাযি. বর্ণিত হাদীছটি শহীদদের সম্পর্কে। তারা যে পোশাক পরিহিত অবস্থায় শহীদ হয়, সে অবস্থায়ই তাদেরকে কবর থেকে উঠিয়ে হাশরে উপস্থিত করা হবে।

কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম পোশাক পরানো হবে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে। যেমন উপরে উদ্ধৃত হযরত আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস রাযি. বর্ণিত হাদীছটি দ্বারা জানা গেল। হযরত আলী রাযি. বর্ণনা করেন-

أول من يكسى خليل الله : إبراهيم قيطيتين، ثم يكسى محمد صلى الله عليه وسلم حلة حبرة عن يمين العرش

‘কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে কাপড় পরানো হবে আর তা হবে এক জোড়া কুবতী কাপড়। তারপর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এক জোড়া ডোরাকাটা পোশাক পরিধান করানো হবে। তিনি থাকবেন আরশের ডান দিকে।

প্রকাশ থাকে যে, এটা হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের এক বিশেষ ফযীলত। বিশেষ ফযীলত দ্বারা সামগ্রিকভাবে সকলের উপর তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ হয় না। সামগ্রিকভাবে সর্বশ্রেষ্ঠ হলেন সমস্ত নবী-রাসুলের প্রধান হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এটা বিভিন্ন দলীল-প্রমাণ দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত।

এ হাদীছ শুনে আম্মাজান হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাযি. ভীষণ উদ্ভিগ্ন হলেন। তাই তিনি বলে উঠলেন يا رسول الله ، الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم الى بعض ؟ (ইয়া রাসূলাল্লাহ! পুরুষ ও নারী সকলে তারা একে অন্যকে দেখবে?)। মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বার বর্ণনায় আছে, আমাদের কি তখন লজ্জা লাগবে না? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন يا عائشة الأمر أشد من أن يهملهم ذلك (হে আয়েশা! এ বিষয়টি যে তাদেরকে ভাবাবে, পরিস্থিতি তারচেয়ে অনেক কঠিন)। অপর এক বর্ণনায় আছে فقالت عائشة : فكيف بالعوامات؟ قال: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه ‘হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাযি. বললেন, তখন সতরের ব্যাপারটা কেমন হবে? তিনি বললেন, (সে চিন্তা করো না। আল্লাহ তা‘আলা তো বলেই দিয়েছেন, لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه

প্রত্যেকের এমন দুশ্চিন্তা দেখা দেবে, যা তাকে অন্যের থেকে ব্যস্ত করে রাখবে।^{৯৩} অপর এক বর্ণনায় এসেছে। হযরত আয়েশা রাযি. বলে উঠেন-
 وا سؤأته، الرجال والنساء يحشرون جميعاً، ينظر بعضهم إلى سوء بعض؟ فقال: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه الآية، وزاد: ولا ينظر الرجال إلى النساء، ولا النساء إلى الرجال، شغل بعضهم عن بعض
 'কী লজ্জার কথা! নারী-পুরুষ সকলকে একত্র করা হবে আর তারা একে অন্যের সতর দেখবে! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,
 “সেদিন তাদের প্রত্যেকের এমন দুশ্চিন্তা দেখা দেবে, যা তাকে অন্যের থেকে ব্যস্ত করে রাখবে -সূরা আবাসা : ৩৭”। পুরুষগণ নারীদের দিকে তাকাবে না, নারীরাও পুরুষদের দিকে তাকাবে না। প্রত্যেকে নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত থাকবে, অন্যকে নিয়ে ভাবার অবকাশ পাবে না।
 মোদ্দা কথা হলো, মানুষ তো একে অন্যের দিকে লক্ষ করে যখন আরামে থাকে। হাশরের ময়দান আরামের জায়গা নয়। সকলেই থাকবে ভীষণ উদ্বেগ-উৎকর্ষার মধ্যে। তখন বন্ধু বন্ধুকে ভুলে যাবে। এমনকি মা'ও তার সন্তানের দিকে ফিরে তাকানোর অবকাশ পাবে না। প্রত্যেকে নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকবে। কার শরীরে কাপড় আছে বা নেই, কারও সেদিকে তাকানোর ফুরসত থাকবে না।

কিয়ামতের অন্যতম প্রধান ঘটনা হলো শিঙ্গায় (الصُّور) ফুঁক দেওয়া। এ দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন ফেরেশতা ইসরাফিল (আ.)। কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন وَنُفِّخُ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ যখন শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হবে, তখন আসমান ও জমিনে যারা আছে তারা সবাই অজ্ঞান (বা মৃত্যুবরণ) করবে।^{৯৪} প্রথমবার শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ যাদের ইচ্ছা করবেন তারা ছাড়া সমগ্র সৃষ্টি মৃত্যুবরণ করবে। পৃথিবীর সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবে। এরপর দ্বিতীয়বার শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন ثُمَّ نَفِّخُ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ فِي يَوْمٍ قِيَامٍ অতঃপর আবার শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হবে, তখন তারা সবাই দাঁড়িয়ে তাকিয়ে থাকবে।^{৯৫} এই দ্বিতীয় ফুঁকের মাধ্যমেই সকল মানুষ কবর থেকে পুনরুত্থান, দ্বিতীয় ফুঁকের পর পৃথিবীর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যত মানুষ জন্মগ্রহণ করেছে, সবাই কবর থেকে জীবিত হয়ে বের হবে।

৯৩. সূরা আবাসা : ৩৭

৯৪. সূরা আয-যুমার: ৬৮

৯৫. সূরা আয-যুমার: ৬৮

আল্লাহ তাআলা বলেন **يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا** সেদিন তারা দ্রুত কবর থেকে বেরিয়ে আসবে।^{৯৬} অন্য আয়াতে বলেন **وَإِذَا الْقُبُورُ** যখন কবরসমূহ উন্মুক্ত করা হবে।^{৯৭} এ সময় ধনী-গরিব, রাজা-প্রজা, নবী-উম্মত—সকল মানুষ সমানভাবে আল্লাহর সামনে উপস্থিত হবে।

হাদিসে এসেছে যে, মানুষ পুনরুত্থিত হবে, খালি পায়ে, উলঙ্গ অবস্থায়, খতনাবিহীন, সম্পদ ও পার্থিব পরিচয় ছাড়া। তাদের একমাত্র সম্বল হবে তাদের ঈমান ও আমল।

পুনরুত্থান অস্বীকারকারীদের জবাব:

মক্কার মুশরিকরা বলত মাটি হয়ে যাওয়ার পর আবার কীভাবে জীবিত হওয়া সম্ভব? কুরআন তাদের জবাবে বহু যুক্তি প্রদান করেছে। যিনি প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন, তিনি পুনরায় সৃষ্টি করতেও সক্ষম। দ্বিতীয় যুক্তি প্রতিদিন মৃত জমিকে জীবিত করা আল্লাহর ক্ষমতার নিদর্শন। তৃতীয় যুক্তি, আসমান-জমিন সৃষ্টি করা মানুষের পুনঃসৃষ্টি অপেক্ষা আরও বড় কাজ। আল্লাহ তাআলা বলেন **أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ** যিনি আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি তাদের পুনরায় সৃষ্টি করতে সক্ষম নন?^{৯৮} পুনরুত্থানের উদ্দেশ্য আল্লাহ তাআলা মানুষকে পুনরুত্থিত করবেন আমলের হিসাব গ্রহণের জন্য, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য, সৎকর্মশীলদের পুরস্কৃত করার জন্য, অপরাধীদের শাস্তি দেওয়ার জন্য। তিনি বলেন **فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ** যে অণু পরিমাণ সৎকর্ম করবে, সে তা দেখতে পাবে। আর যে অণু পরিমাণ অসৎকর্ম করবে, সেও তা দেখতে পাবে।^{৯৯} এই আলোচনার মাধ্যমে আমরা জানতে পারি, পুনরুত্থানের প্রতি বিশ্বাস ইসলামী আকীদার অপরিহার্য অংশ। আল্লাহ তাআলা যিনি প্রথমবার মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, তিনিই মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত করবেন। শিঙ্গায় দ্বিতীয়বার ফুঁক দেওয়ার পর সব মানুষ কবর থেকে পুনরুত্থিত হবে। কিয়ামতের দিন মানুষ সম্পদ বা ক্ষমতা নয়, বরং ঈমান ও আমল নিয়ে আল্লাহর সামনে উপস্থিত হবে। পুনরুত্থানের বিশ্বাস মানুষকে জবাবদিহিমূলক জীবনযাপন, নেক আমল

৯৬. সূরা আল-মাদারিজ: ৪৩

৯৭. সূরা আল-ইনফিতার: ৪

৯৮. সূরা ইয়াসীন: ৮১

৯৯. সূরা আয-যিলযাল: ৭-৮

এবং পাপ থেকে বেঁচে থাকার অনুপ্রেরণা দেয়। পুনরুত্থান ইসলামী বিশ্বাসের এমন একটি মৌলিক সত্য, যা কুরআন ও সহিহ হাদিস দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা শিঙ্গায় দ্বিতীয়বার ফুঁক দেওয়ার মাধ্যমে সমস্ত মানুষকে পুনরায় জীবিত করবেন এবং তাদের হিসাব গ্রহণের জন্য একত্রিত করবেন। এই বিশ্বাস একজন মুমিনকে আল্লাহভীরু, সৎ ও জবাবদিহিমূলক জীবন গড়তে সহায়তা করে।

হাশর কী?

হাশর (الحشر) শব্দের অর্থ হলো, একত্রিত করা বা সমবেত করা। ইসলামী পরিভাষায়, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা পৃথিবীর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সকল মানুষকে হিসাব-নিকাশের জন্য একটি বিশাল ময়দানে একত্রিত করবেন। এই সমাবেশকে হাশর বলা হয় এবং সেই স্থানকে বলা হয় হাশরের ময়দান (মাহশার)। আল্লাহ তাআলা বলেন **يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ** সেদিন আমি মুতাকিদের পরম দয়াময়ের কাছে সম্মানিত অতিথি হিসেবে সমবেত করব এবং অপরাধীদের জাহান্নামের দিকে তৃষ্ণার্ত অবস্থায় তাড়িয়ে নিয়ে যাব।¹⁰⁰

হাশরের ময়দানের ভয়াবহ চিত্র :

হাশরের মাঠের চিত্র হবে অত্যন্ত ভয়াবহ। সেদিন পৃথিবী সৃষ্টি থেকে শুরু করে ধ্বংস হওয়ার পর্যন্ত সমস্ত মানুষকে জমায়েত করা হবে। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে- **يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمُوتُ وَبَرَزُوا** সেদিন পরিবর্তিত করা হবে এ পৃথিবীকে অন্য পৃথিবীতে এবং পরিবর্তিত করা হবে আসমান সমূহকে এবং লোকেরা পরাক্রমশালী এক আল্লাহর সামনে হাজির হবে।¹⁰¹

عن سهل بن سعد قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى أَرْضٍ بَيْضَاءَ عَفْرَاءَ ، كَقُرْصَةِ النَّقِيِّ ، لَيْسَ فِيهَا مَعْلَمٌ لِأَحَدٍ

রাসুল সা. বলেন, কিয়ামতের দিন সাদা ময়দার রুটির মতো চকচকে একটি মাঠের উপর সমস্ত মানুষকে একত্রিত করা হবে। সেখানে কারও কোনো নিশানা থাকবে না।¹⁰² (বুখারি : কিতাবুত রিকাক)

হাশরের ময়দানে মানুষ প্রিয়জনদের ভুলে যাবে :

100. সূরা মারইয়াম: ৮৫-৮৬

101. সূরা ইবরাহীম: ৪৮

102. বুখারি, কিতাবুররিকাক- ৬৫২১, মুসলিম, ২৭৯০

হাশরের ময়দানে মানুষ তার আপনজনদের ভুলে যাবে। সবাই নিজের চিন্তায় ব্যতিব্যস্ত থাকবে। হজরত রাসূল সা. বললেন-

عن عائشة، أنها ذكرت النار فبكت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما يبكيك؟) قالت: ذكرت النار فيكيت، فهل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما في ثلاثة مواطن فلا يذكر أحد أحدا: عند الميزان حتى يعلم أيخف ميزانه أو يثقل، وعند الكتاب حين يقال {هاؤم اقرءوا كتابيه} حتى يعلم أين يقع كتابه أفي يمينه أم في شماله أم من وراء ظهره، وعند الصراط إذا وضع بين ظهري جهنم

‘তিনটি স্থানে কেউ কারও কথা স্মরণ রাখবে না। ১. মিয়ানের নিকট। সেখানে প্রত্যেকেই চরম উদ্ভিন্ন হয়ে জানতে চাইবে যে, তার নেকির পাল্লা হালকা হয়, নাকি ভারী হয়! ২. আমলনামা প্রদানের সময়, যখন প্রত্যেককে বলা হবে- ‘তোমাদের নিজ নিজ আমলনামা পাঠ কর।’ তখন প্রত্যেকেই ভীষণভাবে অধীর হয়ে জানতে চাইবে যে, তার আমলনামা ডান হাতে দেওয়া হবে নাকি পেছন দিক দিয়ে বাম হাতে দেওয়া হবে। ৩. পুলসিরাতের নিকট, যখন তা জাহান্নামের উভয় পাড় ঘেঁষে উপরে বসানো হবে (এবং তার উপর দিয়ে অতিক্রমের নির্দেশ দেওয়া হবে)। এই তিনটি স্থানে কেউ কাউকে স্মরণ রাখবে না।^{১০৩}

হাশরের ময়দানের অবস্থা হবে অত্যন্ত ভয়াবহ। মানুষ সেখানে দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করবে। কুরআনে বলা হয়েছে يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ সেদিন মানুষ সমগ্র জগতের প্রতিপালকের সামনে দাঁড়িয়ে থাকবে।^{১০৪} হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, মানুষের অবস্থা এমন হবে যে প্রত্যেকে নিজের পরিণতি নিয়ে চিন্তিত থাকবে। কেউ কারও উপকার করতে পারবে না, যদি না আল্লাহ অনুমতি না দেন।

عن المقداد بن عمرو بن الأسود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل - قال سليم بن عامر: فوالله ما أدري ما يعني بالميل؛ أمسافة الأرض، أم الميل الذي تكتحل به العين؟- قال: فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق؛ فمنهم من يكون إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى

103. আবুদাউদ-৪৭৫৫

104. সূরা আল-মুতাফিফীন: ৬

رُكْبَتَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى حَقْوَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْجِمُهُ الْعَرَقُ الْجَمَامًا.
قال: وَأَشَارَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ إِلَى فِيهِ

সহীহ মুসলিমের বর্ণিত আছে, কিয়ামতের দিন সূর্য মানুষের খুব নিকটে এনে দেওয়া হবে। মানুষের আমল অনুযায়ী তারা ঘামে ডুবে থাকবে। মোহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন মানুষ তাদের আমল অনুযায়ী ঘামে নিমজ্জিত হবে। কারও ঘাম টাখনু পর্যন্ত, কারও হাঁটু পর্যন্ত, কারও কোমর পর্যন্ত এবং কারও মুখ পর্যন্ত পৌঁছে যাবে।^{১০৫} এ দৃশ্য মানুষের জন্য অত্যন্ত ভীতিকর হবে। এই কঠিন দিনে কিছু সৌভাগ্যবান মানুষ আল্লাহর আরশের ছায়া লাভ করবেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন সাত শ্রেণির মানুষকে আল্লাহ সেদিন তাঁর আরশের ছায়ায় স্থান দেবেন, যেদিন তাঁর ছায়া ছাড়া আর কোনো ছায়া থাকবে না।

عن أبي هريرة رضي الله عنه : عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعت امرأته ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه) أخرجه البخاري، كتاب الزكاة، باب الصدقة باليمين

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (সাঃ) বলেন: সাত ব্যক্তিকে আল্লাহ তা‘আলা তাঁর (আরশের) নিচে ছায়া দান করবেন যে দিন তাঁর ছায়া ব্যতীত অন্য কোন ছায়া থাকবে না। (তারা হলেন): ন্যয়পরায়ণ শায়ক, ঐ যুবক যে আল্লাহর ইবাদতে বেড়ে উঠেছে, ঐ ব্যক্তি যার হৃদয় সর্বদা মসজিদের সাথে সম্পৃক্ত, ঐ দুই ব্যক্তি যারা একে অপরকে ভালবাসে আল্লাহর সন্তুষ্টির নিমিত্তে এবং পরস্পরে মিলিত ও পৃথক হয় তাঁরই নিমিত্তে, ঐ ব্যক্তি যাকে সম্ভ্রান্ত পরিবারের এক সুন্দরী নারী (অশ্লীল কর্মের দিকে) আহবান করেছে, অতপর: সে বলল: আমি অবশ্যই আল্লাহকে ভয় করি, ঐ ব্যক্তি যে এমন গোপনে সদকা দান করেছে যে, তার বাম হাত ও টের পায়নি তার ডান হাত যা দান করেছে, আর ঐ ব্যক্তি যে নিরবে নিভৃতে আল্লাহকে স্মরণ করেছে অতপর: অশ্রু বিসর্জন দিয়েছে।^{১০৬}

105. সহীহ মুসলিম-২৮৪৬

106. বুখারী, কিতাবুয্ যাকাত, বাবুস্ সাদাকাহ্ বিল ইয়ামিন, সহীহ, ১০৩১

বর্ণিত আছে এই সাত শ্রেণির মধ্যে রয়েছেন ন্যায়পরায়ণ শাসক, আল্লাহর ইবাদতে বেড়ে ওঠা যুবক, মসজিদের সঙ্গে অন্তর সংযুক্ত ব্যক্তি, আল্লাহর জন্য পরস্পরকে ভালোবাসে এমন দুই ব্যক্তি, আল্লাহভীরু ব্যক্তি, যিনি ব্যভিচারের আল্হান প্রত্যাখ্যান করেন, গোপনে দানকারী, নির্জনে আল্লাহকে স্মরণ করে অশ্রু বিসর্জনকারী।

প্রত্যেক মানুষের সব কাজ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। কিয়ামতের দিন সেই আমলনামা তাকে দেওয়া হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন **فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ** যার আমলনামা তার ডান হাতে দেওয়া হবে, সে আনন্দে বলবে, এসো, আমার আমলনামা পড়ো। আর যাদের বাম হাতে বা পেছন দিক থেকে আমলনামা দেওয়া হবে, তারা ভীষণ অনুতপ্ত হবে।^{০০০}

আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক মানুষের ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতম কাজের হিসাব নেবেন। তিনি বলেন **وَنُضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ** কিয়ামতের দিন আমি ন্যায়বিচারের পাল্লা স্থাপন করব। তখন কারও প্রতি সামান্যও জুলুম করা হবে না।^{০০০} আল্লাহর বিচারে কোনো অন্যায় বা পক্ষপাত থাকবে না। মীযান (আমল ওজন) হিসাবের পর মানুষের আমল ওজন করা হবে। যার নেক আমলের পাল্লা ভারী হবে, সে সফল হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন **فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ** যার পাল্লা ভারী হবে, সে সুখময় জীবনে থাকবে।^{০০০} আর যার পাল্লা হালকা হবে, তার পরিণতি হবে জাহান্নাম। নবী করিম (সা.)-কে আল্লাহ তাআলা হাউজে কাউসার দান করবেন। মুমিনরা সেখানে উপস্থিত হয়ে পানি পান করবে। যে একবার সেই পানি পান করবে, সে আর কখনো তৃষ্ণার্ত হবে না। তবে যারা দ্বীনের মধ্যে বিদআত ও বিকৃতি সৃষ্টি করবে, তারা এই হাউজ থেকে বঞ্চিত হবে—এ মর্মে সহিহ হাদিসে সতর্কবাণী এসেছে।

হাশরের ময়দানে মানুষ দীর্ঘ প্রতীক্ষায় ক্লান্ত হয়ে নবীদের কাছে সুপারিশের আবেদন করবে। অবশেষে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে মাকামে মাহমুদ দান করা হবে এবং তিনি আল্লাহর অনুমতিতে মহান শাফাআত করবেন।^{০০০}

০০০. সূরা আল-হাক্কাহ: ১৯

০০০. সূরা আল-আয্হিয়া: ৪৭

০০০. সূরা আল-কারিয়াহ: ৬-৭

০০০. বুখারি, হা. নং ৭৫১০; মুসলিম, হা. নং ১৯৩

ثُمَّ أُخْرِجُ لَهُ سَاجِدًا، فَيُقَالُ لِي: يَا مُحَمَّدُ، ارْفَعْ رَأْسَكَ، وَفَلَّ يُسْمَعُ لَكَ، وَسَلَّ ثَعَطَهُ، وَاشْفَعُ تُشَفِّعُ

অর্থ: অতঃপর আমি তাঁর জন্য সিজদায় লুটিয়ে পড়ব। তখন আমাকে বলা হবে- ‘হে মুহাম্মদ! তোমার মাথা উঠাও, তুমি বলো- তোমার কথা শোনা হবে। তুমি চাও- তোমাকে দেওয়া হবে। তুমি সুপারিশ করো- তোমার সুপারিশ কবুল করা হবে।

আল্লাহ তাআলা বলেন لَا يَذْنِبُهُ عِنْدَهُ الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ তাঁর অনুমতি ছাড়া কে তাঁর কাছে সুপারিশ করতে পারে? (সূরা আল-বাকার: ২৫৫) এ থেকে বোঝা যায়, শাফাআত হবে কেবল আল্লাহর অনুমতিক্রমে।

হাশরের ময়দান কোথায় হবে?

শামে হাশরের ময়দান হবে মর্মে ছহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। আর তৎকালীন শাম বর্তমানে সিরিয়া, জর্দান, লেবানন, ফিলিস্তিন ও ইসরাঈলের পুরো ভূখন্ড এবং ইরাক, তুরস্ক, মিসর ও সউদী আরবের কিছু অংশকে শামিল করে।^{১১১} আবু যর গিফারী (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, রাসূল স. বলেন, ‘শাম হ’ল একত্রিত হওয়ার ও পুনরুত্থিত হওয়ার স্থান।^{১১২} অন্য বর্ণনায় তিনি হাশরের স্থান হিসাবে শামের দিকে ইশারা করেছেন।^{১১৩} মনে রাখতে হবে যে, ক্বিয়ামতের দিন বর্তমান পৃথিবী পরিবর্তিত হয়ে অন্য পৃথিবীতে পরিণত হবে।^{১১৪} এবং পাহাড়-পর্বত সব একাকার হয়ে সমতল হয়ে যাবে।^{১১৫} যেটা মানুষের কল্পনার বাইরে।

সিরাত বা পুলসিরাত :

জাহান্নামের ওপর একটি সেতু স্থাপন করা হবে, যাকে সিরাত বা পুলসিরাত বলা হয়। সব মানুষকে এর ওপর দিয়ে অতিক্রম করতে হবে।

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ويُضْرَبُ الصِّرَاطُ بَيْنَ ظَهْرَيَّ جَهَنَّمَ، فَأَكُونُ أَنَا وَأُمَّتِي أَوَّلَ مَنْ يُجِيزُهَا)

و عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (فيُضْرَبُ الصِّرَاطُ بَيْنَ ظَهْرَانِي جَهَنَّمَ فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يَجُوزُ مِنَ الرُّسُلِ)

111. উইকিপিডিয়া

১১২. সহীহুল জামে‘ হা. নং ৩৭২৬

১১৩. মুসনদে আহমদ হা.নং ২০০৪৩, সহীহুল জামে‘ হা.নং ২৩০২)

১১৪. সূরা ইবরাহীম ৪৮

১১৫. সূরা ভূহা:১০৬

بِأَمْرِهِ، وَلَا يَتَكَلَّمُ يَوْمَئِذٍ أَحَدٌ إِلَّا الرُّسُلُ، وَكَلَامُ الرُّسُلِ يَوْمَئِذٍ: اللَّهُمَّ سَلِّمْ
(سَلِّمْ)

অর্থাৎ “জাহান্নামের উপর পুলসিরাত স্থাপন করা হবে। তখন রাসূলদের মধ্যে আমিই সর্ব প্রথম আমার উম্মতকে নিয়ে তা অতিক্রম করবো। সেদিন রাসূলগণ ছাড়া আর কেউ কথা বলবে না। আর সেদিন রাসূলদের কথা হবে- হে আল্লাহ! নিরাপদ রাখুন, নিরাপদ রাখুন।” ১১১

সহিহ হাদিসে এসেছে কেউ বিদ্যুতের গতিতে পার হবে, কেউ বাতাসের গতিতে, কেউ দৌড়ে, কেউ হাঁটতে হাঁটতে, আবার কেউ জাহান্নামে পতিত হবে। এটি মানুষের ঈমান ও আমলের ওপর নির্ভর করবে।

জান্নাত ও জাহান্নামের দিকে গমন:

সব পরীক্ষা ও হিসাব শেষে আল্লাহ তাআলা মানুষের চূড়ান্ত পরিণতি নির্ধারণ করবেন। আল্লাহ বলেন جَحِيمٌ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ নিশ্চয়ই সৎকর্মশীলরা থাকবে জান্নাতের সুখে এবং পাপীরা থাকবে জাহান্নামের আগুনে। ১১২ এটাই হবে মানুষের চিরস্থায়ী আবাস।

প্রত্যেক ব্যক্তির একথা দৃঢ়ভাবে জেনে রাখা দরকার-

১. পৃথিবীর জীবন ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু আখিরাত চিরস্থায়ী। ২. প্রতিটি কাজের হিসাব আল্লাহর কাছে দিতেই হবে। ৩. নেক আমলই প্রকৃত সম্পদ। ৪. অন্যায়, জুলুম ও পাপ একদিন বিচারাধীন হবে। ৫. আল্লাহর রহমত লাভের জন্য ঈমান, তাকওয়া ও সৎকর্ম অপরিহার্য। ৬. রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সূন্নাহ অনুসরণই মুক্তির অন্যতম পথ।

জীবনে পুনরুত্থান ও হাশরের বিশ্বাস এর প্রভাব মানুষের জীবনকে সৎ ও জবাবদিহিমূলক করে তোলে। একজন মুমিন যখন জানে যে তার প্রতিটি কথা, কাজ ও নিয়ত লিপিবদ্ধ হচ্ছে এবং একদিন তার বিচার হবে, তখন সে মিথ্যা ও প্রতারণা থেকে বিরত থাকে, মানুষের হক আদায়ে সচেতন হয়, ইবাদতে যত্নবান হয়, অন্যায় ও পাপ থেকে নিজেকে রক্ষা করে, আখিরাতকে প্রাধান্য দিয়ে জীবন পরিচালনা করে। এভাবেই আখিরাতের বিশ্বাস ব্যক্তি ও সমাজে নৈতিকতা, ন্যায়বিচার ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। হাশরের ময়দান মানবজাতির ইতিহাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও ভয়াবহ সমাবেশ। সেখানে ধনী-গরিব, শাসক-প্রজা, শক্তিশালী-দুর্বল সবাই আল্লাহর সামনে সমানভাবে দাঁড়াবে। কোনো

১১১. বুখারি, হা. নং ৮০৬; মুসলিম, হা. নং ১৮২

১১২. সূরা আল-ইনফিতার: ১৩-১৪

সম্পদ, আত্মীয় বা ক্ষমতা তখন কাজে আসবে না; একমাত্র বিশুদ্ধ ঈমান, আন্তরিক তাওবা এবং নেক আমলই মানুষের মুক্তির কারণ হবে।

তাই একজন মুসলমানের উচিত আখিরাতের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখা, কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করা, মানুষের অধিকার আদায় করা, হারাম ও পাপ থেকে বেঁচে থাকা এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য সর্বদা নেক আমলে আত্মনিয়োগ করা। এভাবেই সে হাশরের কঠিন দিনে আল্লাহর রহমত, আরশের ছায়া এবং জান্নাতের চিরস্থায়ী সফলতা লাভের আশা করতে পারে।

আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে পুনরুত্থান, হাশর, হিসাব-নিকাশ ও আখিরাতের প্রতি দৃঢ় ঈমান দান করুন এবং কিয়ামতের কঠিন দিনে তাঁর রহমত ও আরশের ছায়া নসিব করুন।

লেখক : বিভাগীয় প্রধান, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, সাউদার্ন ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ।

ঐতিহাসিক ১৯ দিনব্যাপি ৫৪তম আন্তর্জাতিক মাহফিলে সীরতুননবী (সাঃ) এর ১৭ তম দি বসের আলোচনা।